দ্বিতীয় দিন উপস্থিত হইলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, চাদরটি কোথায়? আমি ঘটনা শুনাইলাম। তিনি বলিলেন, স্ত্রীলোকদের মধ্য হইতে কাহাকেও পরিধান করিতে দিলে না কেন? মহিলাদের পরিধান করিতে তো কোন অসুবিধা ছিল না। (আবূ দাউদ)

ফায়দা ঃ যদিও চাদর জ্বালানোর প্রয়োজন ছিল না কিন্তু যাহার অন্তরে কাহারো অসন্তুষ্টির আঘাত লাগিয়া আছে তাঁহার এতটুকু চিন্তা করারও ধৈর্য থাকে না যে, ইহার জন্য অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থাও হইতে পারে কিনা। তবে আমার মত অযোগ্য হইলে নাজানি কত ধরনের সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিতাম। যেমন, ইহা কোন ধরনের অসন্তুষ্টি অথবা জিজ্ঞাসা করিয়া লই যে, অন্য কোনভাবে ব্যবহারের অনুমতি হইতে পারে কিনা? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো কেবল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, নিষেধ তো করেন নাই ইত্যাদি ইত্যাদি।

(২) এক আনসারী সাহাবীর ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলা

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর হইতে বাহির হইয়া কোথাও যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে একটি উঁচু কুব্বা (অর্থাৎ গম্বুজবিশিষ্ট ঘর) দেখিতে পাইলেন। সাথীদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি? তাহারা আরজ করিলেন, অমুক আনসারী কুব্বা বানাইয়াছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা শুনিয়া নীরব রহিলেন। অন্য এক সময় ঐ আনসারী খিদমতে হাজির হইয়া সালাম করিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ফিরাইয়া নিলেন, সালামের উত্তরও দিলেন না। তিনি মনে করিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়ত খেয়াল করেন নাই। দ্বিতীয় বার সালাম করিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইবারও মুখ ফিরাইয়া নিলেন এবং উত্তর দিলেন না। এই অবস্থা তাহার কিরূপে সহ্য হইতে পারে? সাহাবা (রাযিঃ)দের মধ্যে যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাহাদের নিকট হইতে জানিতে চাহিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, খোঁজ নিলেন যে, কি হইয়াছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নিতেছেন? তাঁহারা বলিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিরে গিয়াছিলেন। পথিমধ্যে আপনার কুব্বা দেখিয়াছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ইহা কাহার? ইহা শুনিয়া আনসারী (রাযিঃ) তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন এবং উহাকে ভাঙ্গিয়া মাটির সহিত মিশাইয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দিলেন এবং পুনরায় আসিয়া বলিলেনও না। ঘটনাক্রমে হুযূর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই কোন এক সময় ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। তখন দেখিলেন যে, সেই কুব্বাটি আর সেখানে নাই। জিজ্ঞাসা করিলে সাহাবা (রাযিঃ)গণ আরজ করিলেন যে, কয়েক দিন পূর্বে আনসারী ব্যক্তি আপনার অসন্তুষ্টির কথা আলোচনা করিয়াছিল আমরা বলিয়াছিলাম, তিনি আপনার কুব্বা দেখিয়াছেন। তিনি আসিয়া উহা সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া ফেলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, প্রত্যেক নির্মিত ঘরই মানুষের জন্য বিপদ তবে ঐ নির্মিত ঘর যাহা নিতান্ত প্রয়োজনে অপারগতার কারণে নির্মাণ করা হয়। (আবূ দাউদ)

ফায়দা ঃ ইহা পরিপূর্ণ প্রেম ও ভালোবাসার ব্যাপার যে, তাহারা ইহা সহ্যই করিতে পারিতেন না যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী চেহারাকে মলিন দেখিবেন অথবা নিজের প্রতি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসন্তুষ্ট ভাব পরিলক্ষিত হইবে। উক্ত সাহাবী কুব্বাটি ভাঙ্গিয়া ফেলার পর ইহাও করিলেন না যে, আসিয়া সংবাদ দিবেন এবং বলিবেন যে, আপনাকে খুশী করিবার জন্য ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি। বরং ঘটনাক্রমে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন তখন তিনি দেখিতে পাইলেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ করিয়া অর্থ অপচয় অপছন্দ করিতেন। বহু হাদীসে ইহার বর্ণনা আসিয়াছে। স্বয়ং বিবিগণের ঘর খেজুর ডালের তৈরী বেড়ার ছিল। যাহার উপর পর্দার জন্য চট ঝুলিয়া থাকিত। যাহাতে বেগানা লোকের নজর ভিতরে না যাইতে পারে। একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও সফরে গেলেন। হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ)এর সেই সময় কিছু অর্থ আসিল। তিনি তাহার ঘরে খেজুরের ডালের পরিবর্তে কাঁচা ইট লাগাইয়া লইলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফর হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি করিয়াছ? তিনি আরজ করিলেন, উহাতে বেপর্দা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যেসব কাজে মানুষের অর্থ ব্যয় হয় তন্মধ্যে নিকৃষ্টতম হইল পাকা ঘর তৈরী করা।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, একবার আমি ও আমার মাতা আমাদের ঘরের একটি দেওয়াল যাহা খারাপ হইয়া গিয়াছিল মেরামত করিতেছিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিয়া বলিলেন, এই দেওয়াল পড়িয়া যাওয়া হইতেও মৃত্যু অধিক নিকটবর্তী। (আবূ দাউদ)

৩ সাহাবায়ে কেরামের লাল চাদর খুলিয়া ফেলা

হযরত রাফে' (রাযিঃ) বলেন, একবার আমরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এক সফরে ছিলাম। আমাদের উটগুলির উপর লাল রঙের ডোরাযুক্ত চাদর ছিল। তিনি ইহা দেখিয়া বলিলেন, আমি দেখিতে পাইতেছি, তোমাদের উপর লাল রং প্রভাব বিস্তার করিতেছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথা বলামাত্রই আমরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলাম যে, আমাদের ছুটাছুটি দেখিয়া উটগুলিও এদিক সেদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল। আমরা তৎক্ষণাৎ উটের উপর হইতে চাদরগুলি নামাইয়া ফেলিলাম। (আবূ দাউদ)

ফায়দা ঃ সাহাবায়ে কেরামের জীবনে এই ধরনের ঘটনা তেমন কোন গুরুত্ব রাখে না। হাঁ, আমাদের জীবন হিসাবে এইগুলির উপর আশ্চর্যবোধ হয়। তাঁহাদের স্বাভাবিক জীবন এইরূপই ছিল। হযরত ওরোয়া ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) যখন হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে কাফেরদের পক্ষ হইতে দূতস্বরূপ আসিয়াছিলেন (যাহার ঘটনা প্রথম অধ্যায়ের তিন নম্বর ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে) তখন তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত মুসলমানদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি মক্কায় ফিরিয়া যাইয়া কাফেরদের নিকট বলিয়াছিলেন যে, আমি বড় বড় বাদশাহদের দরবারে দূত হিসাবে গিয়াছি, রোম, পারস্য ও আবিসিনিয়ার বাদশাহদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি কিন্তু কোন বাদশাহকে দরবারের লোকেরা এই পরিমাণ সম্মান করিতে দেখি নাই, যে পরিমাণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীরা তাহার সম্মান করে। কখনও তাঁহার থুথু মাটিতে পড়িতে দেয় না। কাহারো না কাহারো হাতে পড়ে এবং সে উহা মুখে ও শরীরে মাখিয়া লয়। যখন তিনি কোন আদেশ করেন তখন প্রত্যেক ব্যক্তি উহা পালন করার জন্য দৌড়িয়া যায়। যখন তিনি অযু করেন তখন অযুর পানি শরীরে মাখিবার ও লইবার জন্য এমনভাবে দৌড়াইতে থাকে যেন নিজেদের মধ্যে লড়াই ও ঝগড়া বাঁধিয়া যাইবে। আর যখন তিনি কথা বলেন তখন সবাই চুপ হইয়া যায়। তাঁহার মহত্ব ও মর্যাদার কারণে কেহ তাঁহার দিকে চোখ উঠাইয়া তাকাইতে পারে না। (বুখারী)

৪ যুবাব শব্দের কারণে হযরত ওয়ায়েল (রাযিঃ)এর চুল কাটিয়া ফেলা

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাযিঃ) বলেন, আমি একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হইলাম। আমার

মাথার চুল বেশ লম্বা ছিল। আমি সামনে আসিলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যুবাব, যুবাব। আমি মনে করিলাম যে, আমার চুল সম্পর্কে বলিয়াছেন। আমি ফিরিয়া গেলাম এবং উহা কাটাইয়া ফেলিলাম। পরদিন যখন খিদমতে হাজির হইলাম তখন বলিলেন, আমি তোমাকে বলি নাই, তবে ইহা ভাল করিয়াছ। (আবূ দাউদ)

ফায়দা ঃ 'যুবাব' শব্দের অর্থ অশুভও হয় এবং খারাপ বস্তুও হয়। ইহা তো ইশারার উপর প্রাণ বিসর্জন দেওয়া ব্যাপার। মনোভাব বুঝিবার পর যদিও উহা ভুলই বুঝিয়াছিলেন উহার উপর আমল করিতে দেরী করিতেন না। এখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াই দিয়াছেন যে, আমি তোমাকে বলি নাই কিন্তু যেহেতু তিনি নিজের সম্বন্ধে বুঝিয়াছেন সেইহেতু সাধ্য কি যে দেরী হইবে?

ইসলামের প্রাথমিক যুগে নামাযে কথা বলা জায়েয ছিল পরে উহা নিষিদ্ধ হইয়া যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হইলেন। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়িতেছিলেন। তিনি পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী সালাম করিলেন। যেহেতু নামাযে কথাবলা নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দেন নাই। হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবাব না দেওয়াতে নতুন পুরাতন সমস্ত বিষয়ের চিন্তা আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। কখনও ভাবিতেছিলাম, অমুক বিষয়ের জন্য অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, কখনও ভাবিতেছিলাম, অমুক বিষয়ের দরুন অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। অবশেষে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাম ফিরাইলেন এবং বলিলেন যে, নামাযে কথা বলা নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাই আমি সালামের জবাব দেই নাই। তখন আমার জানে পানি আসিল।

৫ হযরত সুহাইল ইবনে হানযালিয়া (রাযিঃ)এর অভ্যাস এবং খুরাইম (রাযিঃ)এর চুল কাটাইয়া দেওয়া

দামেশকে সুহাইল ইবনে হানযালিয়া (রাযিঃ) নামে এক সাহাবী বাস করিতেন। তিনি অত্যন্ত নিরিবিলি থাকিকেন। কাহারো সহিত মেলামেশা খুব কম করিতেন এবং কোথাও যাওয়া–আসাও করিতেন না। সারাদিন নামাযে মশগুল থাকিতেন অথবা তাসবীহ ও অযীফা পাঠে মগ্ন থাকিতেন। মসজিদে যাতায়াতের পথে প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবু দারদা (রাযিঃ)এর নিকট দিয়া যাইতেন। আবু দারদা (রাযিঃ) বলিতেন, কোন

ভালকথা শুনাইয়া যাও তোমার কোন ক্ষতি হইবে না, আমাদের উপকার হইয়া যাইবে। তখন তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানার কোন ঘটনা বা কোন হাদীস শুনাইয়া দিতেন। একদিন আবু দারদা (রাযিঃ) অভ্যাস অনুযায়ী আরজ করিলেন, কোন ভালকথা শুনাইয়া যাও। তিনি বলিতে লাগিলেন, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন যে, খুরাইম আসাদী ভাল মানুষ যদি তাহার মধ্যে দুইটি বিষয় না হইত। একটি হইল, তাহার মাথার চুল বেশী লম্বা থাকে, দ্বিতীয়টি হইল সে টাখনুর নীচে লুঙ্গি পরে। তাঁহার নিকট হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথা পৌঁছা মাত্রই চাকু লইয়া কানের নীচের চুল কাটিয়া ফেলিলেন এবং অর্ধ হাঁটু পর্যন্ত লুঙ্গি পরিতে শুরু করিলেন। (আবূ দাউদ)

ফায়দা ঃ কোন কোন বর্ণনামতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাঁহাকে এই দুইটি কথা বলিয়াছেন। আর তিনি কসম খাইয়া বলিয়াছেন যে, এখন হইতে এইরূপ হইবে না। তবুও উভয় বর্ণনায় মূলতঃ কোন দ্বন্দ্ব নাই। কেননা হইতে পারে যে, স্বয়ং তাহাকেও বলিয়াছেন এবং অনুপস্থিতিতেও বলিয়াছেন এবং যাহারা শুনিয়াছেন তাহারা তাহার নিকট যাইয়া বলিয়াছেন।

(৬) হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ)এর আপন পুত্রের সহিত কথা না বলা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) একবার বলিলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছিলেন যে, তোমরা মহিলাদিগকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দিও। ইবনে ওমর (রাযিঃ)এর জনৈক পুত্র বলিলেন, আমরা তো অনুমতি দিতে পারি না। কেননা তাহারা ভবিষ্যতে ইহাকে অবাধে চলাফেরা এবং ফেতনা ও খারাবীর বাহানা বানাইয়া লইবে। হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং কঠোর ভাষায় বকাবকি করিলেন ও বলিলেন যে, আমি তো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ শুনাইতেছি আর তুমি বলিতেছ যে, অনুমতি দিতে পারি না। ইহার পর হইতে সব সময়ের জন্য সেই ছেলের সহিত কথা বলা বন্ধ করিয়া দিলেন। (মুসলিম, আবূ দাউদ)

ফায়দা ঃ 'ফেতনার বাহানা বানাইয়া লইবে' ছেলের এই উক্তি তখনকার অবস্থা দৃষ্টে ছিল। তাই হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এই যমানার মহিলাদের অবস্থা দেখিতেন তবে অবশ্যই মহিলাদের মসজিদে যাইতে নিষেধ করিয়া

দিতেন। অথচ হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর যমানা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানা হইতে তেমন বেশী পরের নয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ)এর ইহা সহ্য হইল না যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শুনিয়া উহাতে কোনরূপ দ্বিধা সঙ্কোচ করা হইবে। শুধু এই কারণে যে, সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ অমান্য করিয়াছে। সারাজীবন কথা বলেন নাই। আর এই ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দেরকেও কষ্ট করিতে হইয়াছে কেননা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুরুত্বের কারণে, যাহা তাঁহাদের নিকট প্রাণতুল্য ছিল, মহিলাদেরকে মসজিদে যাইতে নিষেধ করাও মুশকিল ছিল। অপরদিকে যমানার ফেতনা ফাসাদের ভয় যাহা তখন হইতে শুরু হইয়া গিয়াছিল। মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেওয়াও মুশকিল ছিল। যেমন হযরত আতেকা (রাযিঃ) যাহার একাধিক বিবাহ হইয়াছিল। তন্মধ্যে হযরত ওমর (রাযিঃ)এর সহিতও বিবাহ হইয়াছিল। তিনি মসজিদে যাইতেন। আর হযরত ওমর (রাযিঃ)এর জন্য ইহা কষ্টদায়ক হইত। কেহ তাহাকে বলিল যে, উমর (রাযিঃ)এর কষ্ট হয়। তিনি বলিলেন, যদি তাহার কষ্ট হয় তবে নিষেধ করিয়া দিক।

হযরত ওমর (রাযিঃ)এর ইন্তিকালের পর হযরত যুবাইর (রাযিঃ)এর সহিত তাহার বিবাহ হয়। তাহার নিকটও ইহা কষ্টদায়ক ছিল কিন্তু নিষেধ করার হিম্মত হয় নাই। তখন একবার যে রাস্তা দিয়া আতেকা (রাযিঃ) এশার নামাযের জন্য যাইতেন সেই রাস্তায় বসিয়া গেলেন এবং যখন তিনি ঐ পথ দিয়া যাইতে লাগিলেন তখন হযরত যুবাইর (রাযিঃ) তাঁহাকে উত্যক্ত করিলেন। স্বামী হিসাবে তাঁহার জন্য ইহা জায়েয ছিল। কিন্তু তিনি অন্ধকারের দরুন বুঝিতে পারেন নাই যে, এই ব্যক্তি কে? ইহার পর হইতে তিনি মসজিদে যাওয়া বন্ধ করিয়া দেন। অন্য সময় হযরত যুবাইর (রাযিঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মসজিদে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলে কেন? তিনি বলিলেন, এখন আর সেই যামানা নাই।

(৭) 'কসর নামায কুরআনে নাই' এই বলিয়া হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ)এর নিকট প্রশ্ন করা

এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, কোরআনে কারীমে মুকীমের নামায সম্পর্কেও উল্লেখ আছে এবং ভয়-ভীতির অবস্থায় নামাযেরও উল্লেখ আছে, কিন্তু মুসাফিরের নামাযের উল্লেখ নাই। তিনি বলিলেন, ভাতিজা! আল্লাহ তায়ালা হুযূর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী বানাইয়া পাঠাইয়াছেন। আমরা অজ্ঞ ছিলাম কিছুই জানিতাম না। সুতরাং আমরা তাঁহাকে যাহা করিতে দেখিয়াছি তাহাই করিব।

ফায়দা ঃ অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা জরুরী নয় বরং আমলের জন্য হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে প্রমাণিত হওয়া যথেষ্ট। স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, আমাকে কোরআন শরীফ দেওয়া হইয়াছে এবং উহার সমপরিমাণ আরো হুকুম-আহকাম দেওয়া হইয়াছে। শীঘ্রই এমন এক সময় আসিবে যে, উদরপূর্ণ লোকেরা নিজের গদির উপর বসিয়া বলিবে যে, শুধু কুরআনকেই দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। উহাতে যে সকল হুকুম-আহকাম আছে উহার উপর আমল কর। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ 'উদরপূর্ণ' কথাটির মর্ম হইল, এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণা সম্পদের নেশার কারণেই পয়দা হইয়া থাকে।

(৮) কংকর লইয়া খেলার কারণে হযরত ইবনে মুগাফফাল (রাযিঃ)এর কথা বন্ধ করা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাযিঃ)এর অল্পবয়স্ক এক ভাতিজা কংকর লইয়া খেলিতেছিল। তিনি দেখিয়া বলিলেন যে, ভাতিজা! এইরূপ করিও না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, উহা দ্বারা কোন উপকার হয় না ; ইহার দ্বারা না শিকার করা যায় আর না শত্রুর কোন ক্ষতি করা যায়। যদি কাহারও গায়ে লাগিয়া যায় তবে হয়ত চক্ষু নষ্ট হইয়া যাইবে অথবা দাঁত ভাঙ্গিয়া যাইবে। ভাতিজা কমবয়সী ছিল তাই যখন চাচাকে অসতর্ক দেখিল আবার খেলায় লাগিয়া গেল। তিনি দেখিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমাকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ শুনাইতেছি তুমি আবার ঐ কাজ করিতেছ? আল্লাহর কসম, আমি তোমার সহিত কখনও কথা বলিব না। অপর এক ঘটনায় উহার পর বলিয়াছেন যে, আল্লাহর কসম আমি তোমার জানাযায় শরীক হইব না এবং তোমার অসুস্থতায় দেখিতে যাইব না। (দারিমী, ইবনে মাজাহ)

ফায়দা ঃ কংকরি দ্বারা খেলার অর্থ, বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর ছোট কঙ্কর রাখিয়া উহা আঙ্গুলের সাহায্যে নিক্ষেপ করা। বাচ্চাদের মধ্যে সাধারণতঃ এই ধরনের খেলাধুলার প্রবণতা হইয়া থাকে। ইহা এমন নয় যে, কোন কিছু শিকার করা যাইতে পারে ; তবে ঘটনাক্রমে কাহারও চোখে লাগিয়া

গেলে জখম করিয়াই দিবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাযিঃ) ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ শুনাইবার পরও সেই ছেলে পুনরায় এই কাজ করিবে। আমরা সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কত এরশাদ শুনিয়া থাকি এবং উহার উপর কতটুকু গুরুত্ব দিয়া থাকি? প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই নিজের ব্যাপারে ফয়সালা করিতে পারে।

(৯) হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রাযিঃ)এর সওয়াল না করার প্রতিজ্ঞা

হাকীম ইবনে হিযাম (রাযিঃ) একজন সাহাবী ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া কিছু চাহিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দান করিলেন। তিনি আবার কোন এক সময় কিছু চাহিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবারও দান করিলেন। তৃতীয় বার আবার চাহিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দান করিলেন এবং এরশাদ করিলেন যে, হাকীম এই মাল সবুজ বাগান স্বরূপ। দেখিতে বড়ই মিষ্টি জিনিস, কিন্তু ইহার নিয়ম হইল যদি ইহা লোভশূন্য অন্তরের সহিত পাওয়া যায় তবে বরকত হয় আর যদি লোভ-লিপ্সার সহিত অর্জন হয় তবে ইহাতে বরকত হয় না। বরং গো-ক্ষুধার রোগীর মত এমন অবস্থা হয় যে, সর্বদা খাইতে থাকে কিন্তু পেট ভরে না। হাকীম (রাযিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার পরে আর কাহাকেও বিরক্ত করিব না। অতঃপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) তাঁহার খেলাফত আমলে হযরত হাকীম (রাযি)কে বাইতুল মাল হইতে কিছু মাল দিতে চাহিলেন কিন্তু তিনি তাহা লইতে অস্বীকার করিলেন। তাহার পরে হযরত ওমর (রাযিঃ) আপন খেলাফত আমলে তাহাকে মাল দেওয়ার জন্য বার বার চেষ্টা করেন কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়া দেন। (বুখারী)

ফায়দা ঃ এই কারণেই আজ আমাদের মালে বরকত হয় না। কেননা, লোভ-লালসা আমাদিগকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে।

(১০) হযরত হুযাইফা (রাযিঃ)এর গোয়েন্দাগিরির উদ্দেশ্যে যাওয়া

হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) বলেন, খন্দকের যুদ্ধে একদিকে মক্কার কাফের ও অন্যান্য বহু গোত্রের কাফের যাহারা আমাদের উপর চড়াও হইয়া আসিয়াছিল এবং হামলা করার জন্য প্রস্তুত ছিল। অপরদিকে স্বয়ং

মদীনা মুনাওয়ারাতে বনু কুরাইযার ইহুদী সম্প্রদায় আমাদের সহিত শত্রুতা করিতে এক পায়ে খাড়া ছিল। তাহাদের পক্ষ হইতে সবসময় আশংকা ছিল যে, কখনও মদীনা মুনাওয়ারাকে খালি দেখিয়া তাহারা আমাদের পরিবার–পরিজনকে সম্পূর্ণরূপে শেষ না করিয়া দেয়। আমরা যুদ্ধের জন্য মদীনার বাহিরে পড়িয়া ছিলাম। মুনাফেকের দল বাড়ীঘর শূন্য ও একলা হওয়ার বাহানা করিয়া অনুমতি লইয়া নিজ নিজ ঘরে ফিরিয়া যাইতেছিল আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কেহই অনুমতি চাহিতেছিল তাহাকে অনুমতি দিতেছিলেন। ইতিমধ্যে একরাত্রে এমন প্রচণ্ড বেগে তুফান আসিল যে, না পূর্বে কখনও এইরূপ আসিয়াছে আর না পরে। এমন ভীষণ অন্ধকার ছিল যে, পাশের ব্যক্তি তো দূরের কথা নিজের হাতও দেখা যাইতেছিল না। বাতাসের বেগ এত প্রচণ্ড ছিল যে, উহার আওয়াজ বজ্রের মত গর্জন করিতেছিল। মুনাফেকরা নিজেদের ঘরে ফিরিয়া যাইতেছিল। আমরা তিন শত লোকের একটি দল সেখানেই রহিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক একজনের অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন এবং এই অন্ধকারের মধ্যেই সবদিকে খোঁজ–খবর রাখিতেছিলেন। ইত্যবসরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। আমার নিকট না তো শত্রু হইতে আত্মরক্ষার কোন হাতিয়ার ছিল আর না শীত হইতে রক্ষা পাওয়ার কোন বস্ত্র ছিল। কেবল ছোট একটি চাদর ছিল যাহা দ্বারা হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা যাইত। উহাও আমার নয় বরং আমার স্ত্রীর ছিল। উহা গায়ে দিয়া হাঁটু গাড়িয়া জমিনের সহিত মিশিয়া বসিয়াছিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কে? আমি বলিলাম, হুযাইফা। কিন্তু শীতের কারণে আমার দ্বারা দাঁড়ানো সম্ভব হইল না এবং লজ্জায় মাটির সহিত লাগিয়া রহিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উঠিয়া দাঁড়াও এবং শত্রুদলের ভিতরে যাইয়া তাহাদের খবর লইয়া আস যে, সেখানে কি হইতেছে। আমি তখন ভয় ও শীতের কারণে সবচেয়ে বেশী দুরাবস্থাগ্রস্ত ছিলাম। কিন্তু হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া রওয়ানা হইয়া গেলাম। যখন আমি রওয়ানা হইলাম তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ احْفَظْهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ وَ عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَ عَنْ شِمَالِهٖ وَ مِنْ فَوْقِهٖ وَ مِنْ تَحْتِهٖ

"হে আল্লাহ! আপনি তাহাকে হেফাজত করুন সম্মুখ হইতে, পিছন হইতে, ডান দিক হইতে, বাম দিক হইতে, উপর হইতে, নীচ হইতে।"

হুযাইফা (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়ার পর হইতে যেন আমার নিকট হইতে ভয়ভীতি ও শীত একেবারেই দূর হইয়া গেল। প্রতি কদমে আমার মনে হইতেছিল, যেন গরমের মধ্যে চলিতেছি। রওয়ানা হওয়ার সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও বলিয়াছিলেন যে, সেখানে কোন কিছু না ঘটাইয়া ফিরিয়া আসিও। কি হইতেছে চুপচাপ দেখিয়া চলিয়া আসিও।

আমি সেখানে পৌঁছিয়া দেখিলাম যে, আগুন জ্বলিতেছে এবং লোকেরা আগুন পোহাইতেছে। এক ব্যক্তি আগুনে হাত গরম করিয়া উহা কোমরে বুলাইতেছে। আর চারিদিক হইতে ফিরিয়া চল, ফিরিয়া চল আওয়াজ আসিতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ গোত্রকে ডাকিয়া বলিতেছে, ফিরিয়া চল। আর বাতাসের তীব্রতার কারণে চারিদিক হইতে তাহাদের তাঁবুর উপর পাথর বর্ষণ হইতেছিল। তাঁবুর রশিগুলি ছিঁড়িয়া যাইতেছিল। ঘোড়া ও অন্যান্য পশুগুলি মারা যাইতেছিল। আবু সুফিয়ান যে ঐ সময় সমগ্র বাহিনীর দলপতি ছিল আগুন পোহাইতেছিল। মনে মনে ভাবিলাম যে, ইহা একটি সুবর্ণ সুযোগ, তাহাকে খতম করিয়া দেই। তূনীর হইতে তীর বাহির করিয়া ধনুকে স্থাপন করিয়াও ফেলিলাম কিন্তু তারপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ, 'সেখানে কোন কিছু ঘটাইও না, দেখিয়া চলিয়া আসিও' মনে পড়িল। তাই তীরটি তূনীরে রাখিয়া দিলাম। তাহাদের সন্দেহ হইল, কাজেই বলিতে লাগিল যে, তোমাদের মধ্যে কোন গুপ্তচর আছে। প্রত্যেকেই নিজের পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির হাত ধরিয়া লও। আমি তাড়াতাড়ি এক ব্যক্তির হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কে? সে বলিতে লাগিল, সুবহানাল্লাহ! তুমি আমাকে চিন না? আমি তো অমুক।

আমি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলাম। যখন অর্ধেক রাস্তায় পৌঁছিলাম তখন প্রায় বিশজন পাগড়ী পরিহিত ঘোড়সওয়ার লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তাহারা বলিলেন, তোমার মনিবকে বলিয়া দিও, আল্লাহ তায়ালা শত্রুদের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তিনি যেন নিশ্চিন্ত থাকেন। আমি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ছোট চাদর গায়ে দিয়া নামায পড়িতেছেন। ইহা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব সময়ের অভ্যাস ছিল যে, যখনই কোন পেরেশানী বা দুঃশ্চিন্তার সম্মুখীন হইতেন তখনই নামাযে মগ্ন হইয়া যাইতেন। নামায শেষ হওয়ার পর আমি সেখানে যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম তাহা আরজ করিলাম। গুপ্তচর সম্পর্কিত ঘটনা

শুনিয়া তিনি মুচকি হাসিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পায়ের কাছে শোয়াইয়া দিলেন এবং নিজ চাদরের কিছু অংশ আমার গায়ের উপর দিয়া দিলেন। আমি আমার বুক তাঁহার পায়ের তালুর সহিত জড়াইয়া লইলাম। (দুররে মানসূর)

ফায়দা ঃ এইসব মনীষীদের জন্যই ছিল এই সৌভাগ্য এবং তাঁহাদের জন্যই ইহা শোভনীয় ছিল যে, এত কষ্ট ও দুর্যোগের মধ্যে তাহাদের নিকট হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ পালন করা দেহ-মন জানমাল সবকিছু হইতে অধিক প্রিয় ছিল। আল্লাহ তায়ালা কোনরূপ যোগ্যতা ছাড়াই আমি অধমকেও যদি তাঁহাদের অনুসরণের কিছু অংশ দান করেন তবে ইহা বিরাট সৌভাগ্যের বিষয় হইবে।

দশম অধ্যায়
মহিলাদের দ্বীনি জযবা

বাস্তব এই যে, মহিলাদের মধ্যে যদি দ্বীনের প্রতি উৎসাহ ও নেক আমলের প্রতি আগ্রহ পয়দা হইয়া যায়, তবে সন্তানের উপর উহার প্রভাব অবশ্যই পড়িবে। পক্ষান্তরে আমাদের যমানায় সন্তানদেরকে শুরুতেই এমন পরিবেশে রাখা হয় যেখানেতাহাদের উপর দ্বীন বিরোধী প্রভাব পড়ে অথবা কমপক্ষে দ্বীনের প্রতি অমনোযোগিতা সৃষ্টি হইয়া যায়—যখন এইরূপ পরিবেশে প্রাথমিক জীবন অতিবাহিত হইবে তবে ইহার ফলাফল কি হইবে তাহা সুস্পষ্ট।

(১) হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)এর তাসবীহাত

হযরত আলী (রাযিঃ) তাঁহার এক শাগরেদকে বলিলেন, আমি তোমাকে আমার নিজের এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বাধিক প্রিয়তমা কন্যা হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)এর ঘটনা শুনাইব কি? শাগরেদ বলিল, অবশ্যই শুনান। তিনি বলিলেন, সে নিজ হাতে জাঁতা ঘুরাইত, যাহার ফলে হাতে দাগ পড়িয়া গিয়াছিল এবং নিজে পানি ভরা মশক বহন করিয়া আনিত যাহার ফলে বুকে মশকের রশির দাগ পড়িয়া গিয়াছিল এবং ঘরের ঝাড়ু ইত্যাদিও নিজেই দিত, যাহার ফলে সমস্ত কাপড় চোপড় ময়লাযুক্ত থাকিত। একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু গোলাম-বাঁদী আসিল। আমি ফাতেম (রাযিঃ)কে বলিলাম, তুমিও যাইয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে একজন খাদেম চাহিয়া লও। যাহাতে তোমার কিছুটা সাহায্য হয়। সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল, সেখানে লোকের সমাগম ছিল। আর সে স্বভাবগত অনেক বেশী লাজুক ছিল। সকলের সম্মুখে পিতার নিকটও চাহিতে লজ্জাবোধ করিল এবং ফিরিয়া আসিল।

পরদিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাশরীফ আনিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, ফাতেমা! তুমি গতকাল কি কাজের জন্য গিয়াছিলে? সে লজ্জায় চুপ রহিল। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহার অবস্থা এই যে, জাঁতা ঘুরানোর কারণে হাতে দাগ পড়িয়া গিয়াছে, পানির মশক বহন করার কারণে বুকে রশির দাগ পড়িয়া গিয়াছে। সর্বদা কাজকর্ম করিবার কারণে কাপড়-চোপড় ময়লাযুক্ত থাকে। আমি গতকাল তাহাকে বলিয়াছিলাম, আপনার কাছে খাদেম আসিয়াছে তাই সেও একজন চাহিয়া লয়। এইজন্য গিয়াছিল।

অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) বলিয়াছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আর আলীর নিকট একটি মাত্র বিছানা। তাহাও একটি দুম্বার চামড়া। রাত্রে উহা বিছাইয়া শয়ন করি আর সকালে উহাতেই ঘাসদানা রাখিয়া উটকে খাওয়াই। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মা! ধৈর্যধারণ কর। হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁহার স্ত্রীর নিকট দশ বছর যাবৎ একটি বিছানাই ছিল। আর তাহাও হযরত মূসা (আঃ)এর জুব্বা। রাত্রে উহা বিছাইয়াই শয়ন করিতেন। তুমি তাকওয়া অর্জন কর। আল্লাহকে ভয় কর। আপন পরোয়ারদিগারের হুকুম আদায় করিতে থাক। ঘরের কাজকর্ম আঞ্জাম দিতে থাক। আর যখন ঘুমানোর জন্য শয়ন করিবে তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করিও। ইহা খাদেম হইতে উত্তম বস্তু। হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) বলিলেন, আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি সন্তুষ্ট আছি। (আবূ দাউদ)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ব্যাপারে যাহা পছন্দ করিবেন উহা আমি খুশীর সহিত গ্রহন করিব। ইহা ছিল দু'জাহানের বাদশাহর কন্যার জীবন। আজ আমাদের কাহারও কাছে যদি দুই-চারটি পয়সা হইয়া যায় তবে তাহার গৃহিনী ঘরের কাজকর্ম তো দূরের কথা নিজের কাজটুকুও করিতে পারে না। পায়খানায় বদনাটিও চাকরানীকেই রাখিয়া আসিতে হয়।

উল্লেখিত ঘটনায় কেবল শয়নকালে উক্ত তাসবীহ পাঠের কথা বর্ণিত

রহিয়াছে। অপর হাদীসে প্রত্যেক নামাযের পর তিনটি কালেমা ৩৩ বার করিয়া এবং ১ বার لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ পড়ার কথাও বর্ণিত হইয়াছে।

② হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর সদকা করা

হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর খেদমতে দেরহাম ভর্তি দুইটি বস্তা পেশ করা হইল। উহাতে এক লক্ষেরও বেশী দেরহাম ছিল। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) একটি থালা আনাইলেন এবং উহা ভরিয়া ভরিয়া বিতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত সব শেষ করিয়া ফেলিলেন। একটি দেরহামও অবশিষ্ট রাখিলেন না। তিনি নিজে রোযা ছিলেন। ইফতারের সময় বাঁদীকে বলিলেন, ইফতারের জন্য কিছু আন। সে একটি রুটি ও যয়তুনের তৈল লইয়া আসিল এবং বলিতে লাগিল, কত ভাল হইত যদি এক দেরহাম দিয়া কিছু গোশতই আনাইয়া লইতেন। আজ আমরা গোশত দ্বারা ইফতার করিতাম। তিনি বলিতে লাগিলেন, এখন বলিলে কি হইবে ঐ সময় স্মরণ করাইলে আমি খরিদ করাইয়া লইতাম। (তাযকেরাহ)

ফায়দা ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ)–এর খেদমতে এই ধরনের হাদিয়া আমীর মুয়াবিয়া (রাযিঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ)এর পক্ষ হইতে পেশ করা হইত। কেননা তখন অত্যন্ত প্রাচুর্য ও সচ্ছলতার যুগ ছিল। ঘরের মধ্যে শস্যের ন্যায় স্বর্ণমুদ্রার স্তূপ পড়িয়া থাকিত। এতদসত্ত্বেও নিজেদের জীবন খুবই সাদাসিধা এবং অতি সাধারণভাবে যাপন করা হইত। এমনকি ইফতারের কথাও চাকরানীর স্মরণ করাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। প্রায় পঁচিশ হাজার টাকার মত বিতরণ করিয়া ফেলিলেন কিন্তু তারপরও এই কথা মনে পড়িল না যে, আমি রোযা রাখিয়াছি এবং গোশত খরিদ করিতে হইবে।

আজকাল এই ধরনের ঘটনা এত বিরল হইয়া গিয়াছে যে, এইসব ঘটনা সত্য হওয়ার ব্যাপারেই দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে। কিন্তু তখনকার সাধারণ জীবন–যাপনের চিত্র যাহাদের সামনে রহিয়াছে তাহাদের কাছে ইহা এবং এই ধরনের শত শত ঘটনাও কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়। স্বয়ং হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর এই ধরনের আরো বহু ঘটনা রহিয়াছে। একবার তিনি রোযা অবস্থায় ছিলেন, ঘরে একটি রুটি ব্যতীত কিছুই ছিল না। জনৈক ভিক্ষুক আসিয়া সওয়াল করিল। খাদেমাকে বলিলেন, রুটিটি তাহাকে দিয়া দাও। সে বলিল, ইফতারের জন্য ঘরে কিছুই নাই। তিনি বলিলেন, কি অসুবিধা, ঐ রুটি তাহাকে দিয়া দাও। সে দিয়া দিল। (মুআত্তা)

একবার তিনি একটি সাপ মারিলেন। স্বপ্নে দেখিলেন, কেহ বলিতেছে, তুমি একজন মুসলমানকে হত্যা করিয়াছ। তিনি বলিলেন, মুসলমান হইলে সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিদের নিকট আসিত না। সে বলিল, কিন্তু পর্দা অবস্থায় আসিয়াছিল। ইহাতে বিচলিত হইয়া জাগ্রত হইলেন। অতঃপর বার হাজার দেরহাম সদকা করিলেন যাহা একজন মানুষের হত্যার বদলা হইয়া থাকে।

ওরোয়া (রাযিঃ) বলেন, একবার আমি তাঁহাকে সত্তর হাজার দেরহাম দান করিতে দেখিয়াছি। তখন তাঁহার জামায় তালি লাগানো ছিল।

(তাবাকাত)

③ হযরত ইবনে যুবাইর (রাযিঃ) কর্তৃক হযরত আয়েশা (রাযিঃ)কে সদকা করা হইতে বাধা দেওয়া

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ) হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর বোনপুত্র ছিলেন। তিনি তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। বলিতে গেলে তিনিই বোনপুত্রকে লালন–পালন করিয়াছিলেন। হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর দানশীলতায় তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন যে, যাহা কিছু আসে সাথে সাথে সবকিছু দান করিয়া ফেলেন এবং নিজে কষ্টভোগ করেন। একবার বলিয়া ফেলিলেন যে, খালাম্মার হাতকে কোন প্রকারে রুখিয়া দেওয়া চাই। এই কথা হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর কানেও পৌঁছিয়া গেল। ইহাতে তিনি অসন্তুষ্ট হইলেন যে, আমার হাত রুখিতে চায় এবং তাহার সহিত কথা না বলার মান্নত স্বরূপ কসম খাইলেন। খালার অসন্তুষ্টিতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ)এর অত্যন্ত দুঃখ হইল। অনেক লোকের মাধ্যমে সুপারিশ করাইলেন। কিন্তু তিনি নিজের কসমের উযর পেশ করিলেন। অবশেষে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ) যখন অত্যন্ত পেরেশান হইলেন তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাতৃবংশের দুইজন ব্যক্তিকে সুপারিশকারী হিসাবে সঙ্গে লইয়া গেলেন। তাহারা উভয়ে অনুমতি লইয়া ভিতরে গেলেন, তিনিও লুকাইয়া তাঁহাদের সহিত গেলেন। যখন তাঁহারা দুইজন পর্দার পিছনে এবং হযরত আয়েশা (রাযিঃ) পর্দার ভিতরে বসিয়া কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন তখন তিনি দ্রুত পর্দার ভিতরে যাইয়া খালাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং খুব কাঁদিলেন এবং অনুনয় বিনয় করিলেন। উক্ত দুই ব্যক্তিও সুপারিশ করিতে থাকিলেন এবং মুসলমানের সহিত কথোপকথন বন্ধ করিয়া দেওয়া সম্পর্কিত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহ স্মরণ করাইতে থাকিলেন এবং এই সম্পর্কে যে

সকল নিষেধাজ্ঞা হাদীসে আসিয়াছে তাহা শুনাইতে থাকিলেন। যদ্দরুন হযরত আয়েশা (রাযিঃ) মুসলমানের সহিত কথা বন্ধ রাখা সম্পর্কে হাদীস শরীফে যে সকল নিষেধাজ্ঞা ও শাস্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে উহা সহ্য করিতে না পারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, অবশেষে ক্ষমা করিয়া দিলেন এবং কথা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার সেই কসমের কাফফারা স্বরূপ বারবার গোলাম আযাদ করিতে থাকেন এমনকি চল্লিশজন গোলাম পর্যন্ত আযাদ করিলেন। যখনই ঐ কসম ভঙ্গ করিবার কথা স্মরণ হইত তখন এত কাঁদিতেন যে, চোখের পানিতে ওড়না পর্যন্ত ভিজিয়া যাইত। (বুখারী)

ফায়দা ঃ আমরা সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এক নিঃশ্বাসে কত কসম করিয়া থাকি এবং উহার কতটুকু পরওয়া করি ইহার জবাব নিজেদেরই ভাবিয়া দেখার বিষয় ; অন্য আর কে সবসময় সঙ্গে থাকিবে যে বলিয়া দিবে? কিন্তু যাহাদের অন্তরে আল্লাহর নামের মর্যাদা রহিয়াছে এবং যাহাদের নিকট আল্লাহর সহিত ওয়াদা করিবার পর তাহা পূর্ণ করা জরুরী তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন যে, ওয়াদা পুরা না হইলে মনের কি অবস্থা হয়। এই কারণেই যখন হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর উক্ত ঘটনা মনে পড়িত তখন অত্যাধিক কাঁদিতেন।

(৪) আল্লাহর ভয়ে হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর অবস্থা

হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর প্রতি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে পরিমাণ মহব্বত ছিল উহা কাহারও নিকট গোপন নহে। এমনকি যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কেহ জিজ্ঞাসা করিল যে, আপনি সবচেয়ে বেশী কাহাকে ভালবাসেন? তখন তিনি বলিলেন, আয়েশাকে। সেই সঙ্গে তিনি মাসায়েল সম্পর্কেও এত অধিক অবগত ছিলেন যে, বড় বড় সাহাবীগণও মাসায়েল জিজ্ঞাসা করার জন্য তাঁহার খেদমতে হাজির হইতেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁহাকে সালাম করিতেন। জান্নাতেও হযরত আয়েশা (রাযিঃ)কে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে। মুনাফেকরা তাঁহার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিলে কোরআন শরীফে তাঁহার পবিত্রতা অবতীর্ণ হয়। স্বয়ং হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, দশটি বৈশিষ্ট্য আমার এমন রহিয়াছে, যাহাতে অন্য কোন বিবিগণ শরীক নাই। ইবনে সাদ (রহঃ) সেই সবগুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

সদকার অবস্থা তো পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহে জানা হইয়াছেই কিন্তু এই সবকিছু সত্ত্বেও খোদাভীতির এই অবস্থা ছিল যে, তিনি বলিতেন, হায়!

আমি যদি বৃক্ষ হইতাম ; সর্বদা তাসবীহ পাঠে রত থাকিতাম আর আখেরাতে আমার কোন হিসাব হইত না। হায়! আমি যদি পাথর হইতাম, হায়! আমি মাটির ঢিলা হইতাম, হায়! আমি যদি পয়দাই না হইতাম। হায়! আমি যদি গাছের পাতা হইতাম, হায়! আমি যদি কোন ঘাস হইতাম। (বুখারী)

ফায়দা ঃ খোদাভীতির এই অবস্থা দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম ও ষষ্ঠ নম্বর ঘটনায়ও বর্ণিত হইয়াছে। ইহা তাঁহাদের সাধারণ অবস্থা ছিল। আল্লাহকে ভয় করা তাহাদেরই ভাগ্যে ছিল।

(৫) হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ)এর স্বামীর দোয়া ও হিজরত

উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে সাহাবী হযরত আবু সালমা (রাযিঃ)এর স্ত্রী ছিলেন। উভয়ের মধ্যে গভীর ভালবাসা ও নিবিড় সম্পর্ক ছিল যাহা এই ঘটনা দ্বারা অনুমান করা যায়। একবার উম্মে সালামা (রাযিঃ) আবু সালামা (রাযিঃ)কে বলিলেন, আমি শুনিয়াছি, যদি স্বামী–স্ত্রী উভয়ই জান্নাতী হয় এবং স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর কোন স্বামী গ্রহণ না করে তবে এই স্ত্রী জান্নাতে সেই স্বামীরই সঙ্গ লাভ করিবে। এমনিভাবে স্বামী যদি অন্য কোন মহিলাকে বিবাহ না করে তবে ঐ স্ত্রীই জান্নাতে তাহার সঙ্গলাভ করিবে। তাই আসুন আমরা উভয়েই এই মর্মে অঙ্গীকার করি যে, আমাদের মধ্য হইতে যে আগে মৃত্যুবরণ করিবে, সে দ্বিতীয় বিবাহ করিবে না। আবু সালামা (রাযিঃ) বলিলেন, তুমি আমার কথা মানিবে কি? উম্মে সালামা (রাযিঃ) বলিলেন, আমি তো এই জন্যই পরামর্শ করিতেছি যে, আপনার কথা মানিব। আবু সালামা (রাযিঃ) বলিলেন, তাহা হইলে তুমি আমার মৃত্যুর পর বিবাহ করিয়া নিও। অতঃপর তিনি দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ! আমার পরে উম্মে সালামাকে আমার চাইতে উত্তম স্বামী দান করুন—যে তাহাকে কোন প্রকার দুঃখ–কষ্ট দিবে না।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে স্বামী–স্ত্রী উভয়ই এক সহিত সঙ্গে আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়াছেন। অতঃপর সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া মদীনায় হিজরত করেন। যাহার বিস্তারিত ঘটনা হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) স্বয়ং বর্ণনা করেন যে, আবু সালামা (রাযিঃ) যখন হিজরতের ইচ্ছা করিলেন তখন নিজের উটের পিঠে সামান উঠাইলেন

এবং আমাকে ও আমার পুত্র সালামাকে উটের পিঠে বসাইলেন আর নিজে উটের রশি ধরিয়া চলিতে শুরু করিলেন। আমার পিতৃবংশ বনু মুগীরার লোকেরা দেখিয়া ফেলিল। তাহারা আবু সালামা (রাযিঃ)কে বলিল, তুমি নিজের ব্যাপারে স্বাধীন হইতে পার কিন্তু আমরা আমাদের মেয়েকে তোমার সহিত কেন যাইতে দিব যে, দেশে দেশে ঘুরিয়া ফিরিবে? এই বলিয়া আবু সালামা (রাযিঃ)এর হাত হইতে উটের রশি ছিনাইয়া লইল এবং আমাকে জোরপূর্বক লইয়া গেল। এই ঘটনা যখন আমার শ্বশুরালয় বনু আবদুল আসাদের লোকেরা—যাহারা আবু সালামার আত্মীয়—জানিতে পারিল, তখন তাহারা আমার পিতৃবংশ বনু মুগীরার লোকদের সহিত এই বলিয়া ঝগড়া শুরু করিল যে, তোমাদের মেয়ের ব্যাপারে তো তোমাদের অধিকার আছে কিন্তু যখন তোমরা তোমাদের মেয়েকে তাহার স্বামীর সহিত যাইতে দিলে না তখন আমরা আমাদের ছেলে সালামা (রাযিঃ)কে তোমাদের নিকট কেন ছাড়িয়া দিব? এই বলিয়া আমার ছেলে সালামা (রাযিঃ)কেও আমার নিকট হইতে ছিনাইয়া নিল। এখন আমি, আমার ছেলে সালামা এবং আমার স্বামী তিনজনই পৃথক হইয়া গেলাম। স্বামী তো মদীনায় চলিয়া গেলেন, আমি আমার পিত্রালয়ে রহিয়া গেলাম আর ছেলে তাহার দাদার বাড়ীতে পৌছিয়া গেল। আমি দৈনিক ময়দানে বাহির হইয়া যাইতাম আর সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্রন্দন করিতাম। এইভাবে পূর্ণ এক বৎসর আমার কাঁদিয়া অতিবাহিত হইল, না আমি স্বামীর কাছে যাইতে পারিলাম, আর না সন্তানকে পাইলাম। একদিন আমার এক চাচাত ভাই আমার অবস্থার উপর দয়াপরবশ হইয়া আপন লোকজনকে বলিল, এই অসহায় মেয়েটির উপর কি তোমাদের দয়া আসে না? তোমরা তাহাকে সন্তান এবং স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছ; তাহাকে ছাড়িয়া দাও না কেন?

অবশেষে আমার চাচাত ভাই বলিয়া কহিয়া এই ব্যাপারে সবাইকে সম্মত করিল। তাহারা আমাকে অনুমতি দিয়া দিল যে, তুমি তোমার স্বামীর কাছে যাইতে চাহিলে চলিয়া যাও। ইহা দেখিয়া বনু আবদুল আসাদের লোকেরাও ছেলেকে দিয়া দিল। আমি একটি উট জোগাড় করিয়া ছেলেকে কোলে করিয়া একাই উটের উপর সওয়ার হইয়া মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া গেলাম। তিন চার মাইল অতিক্রম করিবার পর তানয়ীম নামক স্থানে উছমান ইবনে তালহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, একা কোথায় যাইতেছ? আমি বলিলাম, মদীনায় আমার স্বামীর নিকট যাইতেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

তোমার সহিত আর কেহ নাই। আমি বলিলাম, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ নাই। তিনি আমার উটের রশি ধরিয়া আগে আগে চলিতে লাগিলেন। আল্লাহর কসম! উছমানের চাইতে অধিক ভদ্র লোক আমি আর কাহাকেও পাই নাই। যখন উট হইতে নামিবার সময় হইত তখন তিনি উটকে বসাইয়া দূরে কোন গাছের আড়ালে চলিয়া যাইতেন, আমি উট হইতে নামিয়া যাইতাম। আর যখন সওয়ার হওয়ার সময় হইত তখন আসবাবপত্র উটের পিঠে তুলিয়া আমার নিকটে বসাইয়া দিতেন। আমি উহার উপর সওয়ার হইলে তিনি আসিয়া উটের রশি ধরিয়া আগে আগে চলিতে থাকিতেন। এইভাবে আমরা মদীনা মুনাওয়ারায় পৌছিয়া গেলাম। কোবায় পৌছিলে তিনি বলিলেন, তোমার স্বামী এখানেই আছেন। ঐসময় আবু সালামা (রাযিঃ) কোবায়ই অবস্থান করিতেছিলেন। উছমান আমাকে সেখানে পৌছাইয়া নিজে মক্কা মুকাররমায় ফিরিয়া গেলেন। তারপর বলিলেন, আল্লাহর কসম, উছমান ইবনে তালহার চাইতে অধিক ভদ্র ও সৎ ব্যক্তি আমি দেখি নাই। ঐ বৎসর আমি এত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াছি যাহা আর কেহ হয়ত করে নাই। (উসুদুল গাবাহ)

ফায়দা ঃ আল্লাহর উপর ভরসার কারণেই একাকী হিজরতের এরাদায় রওয়ানা দিলেন। আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার সাহায্যের ব্যবস্থাও করিয়া দিলেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহ তাহার সাহায্য করেন। সমস্ত বান্দার অন্তর তাঁহারই নিয়ন্ত্রণাধীন।

হিজরত যদি ফরয হয় তবে কোন মাহরাম না থাকিলে একাকীও সফর করা জায়েয। তাই তাহার একাকী সফর করা শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিকর নহে।

(৬) খাইবারের যুদ্ধে কয়েকজন মহিলার সহিত হযরত উম্মে যিয়াদের অংশগ্রহণ

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় পুরুষদের তো জেহাদে শরীক হওয়ার আগ্রহ ছিলই, যাহার ঘটনাসমূহ ব্যাপকহারে বর্ণনা করা হইয়া থাকে। এইক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষদের চেয়ে পিছনে ছিলেন না। তাহারা সবসময় আগ্রহী থাকিতেন এবং যেখানেই সুযোগ পাইতেন পৌছিয়া যাইতেন। উম্মে যিয়াদ (রাযিঃ) বলেন, আমরা ছয়জন মহিলা খাইবারের যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য রওয়ানা হইলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ পাইয়া আমাদিগকে ডাকিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী চেহারায় গোসসার আলামত

পরিলক্ষিত হইতেছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহার অনুমতি লইয়া আসিয়াছ এবং কাহার সহিত আসিয়াছ? আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা পশম বুনিতে জানি। জেহাদে ইহার প্রয়োজন হয়। আমাদের সহিত জখমের ঔষধও রহিয়াছে। আর কিছু না হোক মুজাহিদদের তীর আগাইয়া দেওয়ার কাজে সাহায্য করিব। কেহ অসুস্থ হইলে তাহার সেবা-শুশ্রূষার কাজে সাহায্য করা যাইতে পারে। ছাতু ইত্যাদি গুলানো এবং পান করানোর ব্যাপারে সাহায্য করিব। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অংশগ্রহণের অনুমতি দিলেন। (আবূ দাউদ)

ফায়দা ঃ আল্লাহ তায়ালা তখনকার মহিলাদের মধ্যেও এমন আগ্রহ ও সাহস পয়দা করিয়াছিলেন যাহা আজকাল পুরুষদের মধ্যেও নাই। লক্ষ্য করিয়া দেখুন, তাহারা নিজ আগ্রহে নিজেরাই পৌঁছিয়া গিয়াছেন এবং কতগুলি কাজ নিজেরা করার সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন।

হুনাইনের যুদ্ধে হযরত উম্মে সুলাইম (রাযিঃ) গর্ভবতী থাকা সত্ত্বেও অংশগ্রহণ করিলেন। ঐ সময় আবদুল্লাহ ইবনে আবি তালহা তাঁহার গর্ভে ছিলেন। সাথে একটি খঞ্জর রাখিতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কিসের জন্য? তিনি বলিলেন, যদি কোন কাফের আমার নিকট আসিয়া যায় তবে তাহার পেটে ঢুকাইয়া দিব। তিনি ইতিপূর্বে উহুদ প্রভৃতি যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। আহতদের চিকিৎসা এবং রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাযিঃ) ও উম্মে সুলাইম (রাযিঃ)কে দেখিয়াছি, তাঁহারা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত মশক ভরিয়া আনিতেন এবং আহতদিগকে পান করাইতেন। আর যখন মশক খালি হইয়া যাইত আবার পূর্ণ করিয়া আনিতেন।

(৭) হযরত উম্মে হারাম (রাযিঃ)এর সামুদ্রিক যুদ্ধে শরীক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

হযরত উম্মে হারাম (রাযিঃ) হযরত আনাস (রাযিঃ)এর খালা ছিলেন। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই তাঁহার ঘরে তশরীফ নিতেন এবং কখনও দুপুরে সেখানেই বিশ্রাম করিতেন। একদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার ঘরে আরাম করিতেছিলেন হঠাৎ মুচকি হাসিয়া ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিলেন। উম্মে হারাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উপর আমার

পিতামাতা কোরবান হউক আপনি কি জন্য মুচকি হাসিতেছিলেন? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমাকে আমার উম্মতের কিছুলোক দেখানো হইয়াছে, যাহারা সমুদ্র পথে যুদ্ধের জন্য এমনভাবে সওয়ার হইয়াছে যেন সিংহাসনে বাদশাহ বসিয়া আছে। উম্মে হারাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দোয়া করুন, আল্লাহ যেন আমাকেও তাহাদের মধ্যে শামিল করিয়া দেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমিও তাহাদের মধ্যে শামিল থাকিবে। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় ঘুমাইলেন এবং কিছুক্ষণ পর আবার মুচকি হাসিয়া ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিলেন। উম্মে হারাম (রাযিঃ) হাসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পুনরায় অনুরূপ উত্তর দিলেন। উম্মে হারাম (রাযিঃ) পনুরায় পূর্বের ন্যায় দরখাস্ত করিলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি দোয়া করুন যেন আমিও তাহাদের মধ্যে হই। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি প্রথম দলে থাকিবে। অতঃপর হযরত উছমান (রাযিঃ)এর খেলাফতকালে হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ) যিনি সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন, জাযায়েরে কাবরাস বা সাইপ্রাস দ্বীপ আক্রমণের অনুমতি চাহিলেন। হযরত উছমান (রাযিঃ) অনুমতি দিয়া দিলেন। আমীরে মুয়াবিয়া (রাযিঃ) একদল সৈন্য লইয়া আক্রমণ করিলেন। যাহাতে উম্মে হারাম (রাযিঃ) ও তাহার স্বামী উবাদা (রাযিঃ) সহ সৈন্য দলে শরীক ছিলেন। ফিরিবার সময় তিনি একটি খচ্চরের উপর সওয়ার হইতেছিলেন। এমতাবস্থায় খচ্চরটি লাফাইয়া উঠিল আর তিনি উহার উপর হইতে পড়িয়া গেলেন। ইহাতে তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া গেল এবং মৃত্যুবরণ করিলেন আর সেখানেই তাঁহাকে দাফন করা হইল। (বুখারী)

ফায়দা ঃ ইহা ছিল জেহাদে অংশগ্রহণের আগ্রহ ও প্রেরণা। প্রত্যেক যুদ্ধেই অংশগ্রহণের দোয়া চাহিতেছিলেন। কিন্তু প্রথম যুদ্ধে যেহেতু তাঁহার ইন্তিকাল নির্ধারিত ছিল, তাই দ্বিতীয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই আর এই জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাতে তাহার অংশগ্রহণের জন্য দোয়াও করেন নাই।

(৮) সন্তানের মৃত্যুতে হযরত উম্মে সুলাইম (রাযিঃ)এর আমল

উম্মে সুলাইম (রাযিঃ) হযরত আনাস (রাযিঃ)এর মা ছিলেন। তিনি তাহার প্রথম স্বামী অর্থাৎ হযরত আনাস (রাযিঃ)এর পিতার ইন্তেকালের পর বিধবা হইয়া যান এবং হযরত আনাস (রাযিঃ)এর লালন পালনের কথা ভাবিয়া কিছু দিন যাবত অন্যত্র বিবাহ বসেন নাই। অতঃপর হযরত

আবু তালহা (রাযিঃ)এর সহিত বিবাহ হয়। তাঁহার ঔরসে এক পুত্র আবু উমাইর জন্মগ্রহণ করেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাহাদের ঘরে যাইতেন তখন তাহার সহিত হাসি-তামাশাও করিতেন। ঘটনাক্রমে আবু উমাইর (রাযিঃ)এর ইন্তেকাল হইয়া গেল। উম্মে সুলাইম (রাযিঃ) তাহাকে গোসল দিলেন, কাফন পরাইলেন এবং একটি খাটের উপর শোয়াইয়া দিলেন। আবু তালহা (রাযিঃ) রোযা ছিলেন। উম্মে সুলাইম (রাযিঃ) তাঁহার জন্য খানাপিনা তৈরী করিলেন এবং তিনি স্বয়ং নিজেও সাজ-সজ্জা করিলেন খুশবু ইত্যাদি লাগাইলেন। রাত্রে স্বামী আসিলেন, খানাপিনাও খাইলেন। সন্তানের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, এখন তো শান্ত মনে হইতেছে। সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া গিয়াছে। তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া গেলেন। স্বামী রাত্রে সহবাসও করিলেন। ভোরে যখন তিনি উঠিলেন তখন বলিতে লাগিলেন যে, একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার ছিল। কেহ যদি কাহাকেও কোন জিনিস ধার স্বরূপ দেয় তারপর সে উহা ফেরত নিতে চাহিলে তখন কি উহাকে ফিরাইয়া দেওয়া উচিত, না ফেরত না দিয়া আটকাইয়া রাখা উচিত? তিনি বলিলেন, অবশ্যই ফিরাইয়া দেওয়া চাই, আটকাইয়া রাখিবার কোন অধিকার নাই। ধার করা বস্তু তো ফেরত দিতেই হইবে। এইকথা শুনিয়া উম্মে সুলাইম (রাযিঃ) বলিলেন, আপনার ছেলে যাহা আল্লাহর আমানত ছিল উহা আল্লাহ ফেরত নিয়াছেন। আবু তালহা (রাযিঃ) ইহাতে দুঃখিত হইয়া বলিলেন, তুমি আমাকে খবরও দিলে না? সকালে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে যাইয়া হযরত আবু তালহা (রাযিঃ) সমস্ত ঘটনা আরজ করিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া দিলেন এবং বলিলেন, হইতে পারে আল্লাহ তায়ালা সেই রাত্রির মধ্যে বরকত দান করিবেন। আর তাহাই হইল। এক আনসারী (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়ার বরকত দেখিয়াছি যে, ঐ রাত্রের গর্ভধারণেই আবদুল্লাহ ইবনে আবি তালহা জন্মগ্রহণ করেন, যিনি নয়টি পুত্রসন্তান লাভ করেন এবং সকলেই কোরআন শরীফ শিক্ষা করিয়াছিলেন। (বুখারী, ফাতহুল বারী)

ফায়দা ঃ বড়ই ধৈর্য ও হিম্মতের বিষয় যে, আপন সন্তান মৃত্যুবরণ করিবে আর এইভাবে উহাকে বরদাশত করিবে যে, স্বামীকেও বুঝিতে দিবে না। আর যেহেতু স্বামী রোযা ছিলেন তাই মনে করিলেন যে, জানিতে পারিলে খানা খাওয়াও মুশকিল হইবে।

(৯) হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ)এর আপন পিতাকে বিছানায় বসিতে না দেওয়া

উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহ্শের স্ত্রী ছিলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়ই একত্রেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হাবশায় হিজরতও একত্রেই করিয়াছেন। সেখানে যাওয়ার পর স্বামী মুরতাদ (ধর্মচ্যুত) হইয়া যায় এবং ঐ মুরতাদ অবস্থায়ই ইন্তেকাল করে। হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) এই বিধবা জীবন হাবশাতেই অতিবাহিত করেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানেই বিবাহের পয়গাম পাঠান এবং হাবশার বাদশাহর মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন হয়। ইহার বিবরণ এই অধ্যায়ের শেষ দিকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিদের বর্ণনায় আসিবে। বিবাহের পর তিনি মদীনা তাইয়্যেবায় চলিয়া আসেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় তাঁহার পিতা আবু সুফিয়ান সন্ধির বিষয়টি আরো পাকা করিবার উদ্দেশ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আলাপ আলোচনার প্রয়োজন ছিল বিধায় মদীনা তাইয়্যেবায় আসেন। মেয়ের সহিত দেখা করিতে গেলেন। সেখানে বিছানা বিছানো ছিল। তিনি উহাতে বসিতে চাহিলে হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) বিছানা উল্টাইয়া দিলেন। পিতা আশ্চর্য হইলেন যে, যে ক্ষেত্রে বিছানা বিছানোর কথা সেক্ষেত্রে সে বিছানো বিছানাকেও গুটাইয়া ফেলিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বিছানা আমার উপযোগী ছিল না এইজন্য গুটাইয়া ফেলিয়াছ, নাকি আমি এই বিছানার যোগ্য ছিলাম না? উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) বলিলেন, ইহা আল্লাহর পবিত্র ও প্রিয় রাসূলের বিছানা আর আপনি মুশরিক হওয়ার কারণে নাপাক। সুতরাং আপনাকে কিভাবে উহার উপর বসাইতে পারি! পিতা এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, আমার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তোমার স্বভাব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উম্মে হাবীবা (রাযিঃ)এর অন্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যে ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল সেইদিকে লক্ষ্য করিলে তিনি ইহা কিভাবে পছন্দ করিতে পারেন যে,কোন অপবিত্র মুশরিক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানায় বসিবে, চাই সে বাপ অথবা যে কেহ হউক না কেন?

একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে চাশতের বার রাকাতের ফযীলত শুনিয়াছেন। অতঃপর আজীবন উহা নিয়মিত আদায় করিয়া গিয়াছেন। তাহার পিতাও যাহার ঘটনা এইমাত্র বর্ণিত হইয়াছে, পরবর্তীতে মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন।

পিতার ইন্তেকালের তৃতীয় দিন খুশবো আনাইয়া ব্যবহার করিলেন এবং বলিলেন, আমার খুশবো ব্যবহার করিবার প্রয়োজন নাই আগ্রহও নাই। কিন্তু আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহা বলিতে শুনিয়াছি যে, কোন মহিলার জন্য আপন স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারও বেলায় তিনদিনের অধিক শোক পালন করা জায়েয নহে। তবে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক পালন করিতে হয়। তাই খুশবো ব্যবহার করিতেছি যাহাতে শোক বুঝা না যায়।

যখন তাহার ইন্তিকালের সময় হইল তখন হযরত আয়েশা (রাযিঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, আমার এবং তোমার মধ্যে সতীনের সম্পর্ক ছিল। আর সতীনদের মধ্যে পরস্পর কোন না কোন বিষয়ে মনোমালিন্য হইয়াই থাকে। আল্লাহ তায়ালা আমাকেও মাফ করুন তোমাকেও মাফ করুন। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমার সবকিছু মাফ করিয়া দিন। এইকথা শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, এই মুহূর্তে তুমি আমাকে অত্যন্ত আনন্দিত করিয়াছ। আল্লাহ তায়ালা তোমাকেও আনন্দিত ও সুখে রাখুন। অতঃপর এমনিভাবে উম্মে সালামা (রাযিঃ)–এর কাছেও এই মর্মে লোক পাঠাইয়াছেন। (তাবাকাত)

ফায়দা ঃ সতীনদের পরস্পর যে ধরনের সম্পর্ক থাকে সেই হিসাবে একজন অপরজনের চেহারাও দেখিতে চায় না। কিন্তু তাহাদের ইহার প্রতি গুরুত্ব ছিল যে, দুনিয়ার ব্যাপার দুনিয়াতেই শেষ হইয়া যাক ; আখেরাতে যেন ইহার বোঝা বহন করিতে না হয়। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁহাদের ভালবাসা ও ভক্তিশ্রদ্ধা কতটুকু ছিল তাহা বিছানার ঘটনা হইতেই অনুমান করা গিয়াছে।

(১০) অপবাদের ঘটনায় হযরত যয়নাব (রাযিঃ)এর হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর পক্ষে সাক্ষ্য দান করা

উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ (রাযিঃ) সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফাত বোন ছিলেন। তিনি প্রথম দিকেই মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন। প্রথমতঃ হযরত যায়েদ (রাযিঃ)এর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। যিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম ছিলেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পালকপুত্রও ছিলেন। তাই তাঁহাকে যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ বলা হইত। কিন্তু হযরত যায়েদ (রাযিঃ)এর সহিত হযরত যয়নাব (রাযিঃ)এর বনিবনা না হওয়ার কারণে তিনি তাঁহাকে তালাক দিয়া দিলেন। জাহিলিয়্যাতের

যুগে এই প্রথা ছিল যে, পালকপুত্রকে সম্পূর্ণরূপে আপন পুত্রের ন্যায় মনে করা হইত এবং তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করা যাইত না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহিলিয়্যাতের এই কুপ্রথাকে নির্মূল করিবার উদ্দেশ্যে হযরত যয়নাব (রাযিঃ)এর নিকট নিজের বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলেন। হযরত যয়নাব (রাযিঃ) জওয়াব দিলেন, আমি আমার রবের সহিত পরামর্শ করিয়া লই। এই বলিয়া তিনি অযু করিলেন এবং নামাযের নিয়ত বাঁধিলেন যাহার বরকতে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ হযরত যয়নাব (রাযিঃ)এর সহিত করিয়া দিলেন এবং কুরআন পাকের আয়াত নাযিল হইল—

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْٓ اَزْوَاجِ
اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ۝

"অতঃপর যায়েদ যখন তাহার হইতে আপন প্রয়োজন মিটাইয়া নিল তখন আমি তাহাকে আপনার বিবাহে দিয়া দিলাম, যাহাতে পালকপুত্রদের স্ত্রীগণ সম্বন্ধে মুমেনদের উপর কোন সংকীর্ণতা না থাকে, যখন তাহারা তাহাদের নিকট হইতে আপন প্রয়োজন মিটাইয়া লইয়াছে। আর আল্লাহর নির্দেশ পূর্ণ হইয়াই থাকিল।"

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর যখন হযরত যয়নাব (রাযিঃ)কে বিবাহের সুসংবাদ দেওয়া হইল তখন তিনি তাহার পরিধানে যে সমস্ত অলংকার ছিল তাহা খুলিয়া সুসংবাদদানকারীকে দিয়া দিলেন এবং নিজে সেজদায় পড়িয়া গেলেন আর দুই মাসের রোযা মান্নত করিলেন। হযরত যয়নাব (রাযিঃ)–এর জন্য ইহা যথার্থই গর্বের বিষয় ছিল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল বিবিদের বিবাহের ব্যবস্থা তাহাদের আত্মীয়–স্বজনরা করিয়াছে কিন্তু হযরত যয়নাব (রাযিঃ)এর বিবাহ আসমানে হইয়াছে এবং কুরআনে পাকে নাযিল হইয়াছে। এই কারণেই হযরত আয়েশা (রাযিঃ)–এর সহিত অনেক সময় মোকাবেলার পালাও আসিয়া যাইত। কেননা তাহারও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সর্বাধিক প্রিয়পাত্রী হওয়ার গর্ব ছিল। আর হযরত যয়নাব (রাযিঃ)এরও আসমানে বিবাহ হওয়ার গর্ব ছিল। এতদসত্ত্বেও হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর প্রতি অপবাদের ঘটনায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্যদের মধ্যে যখন যয়নাব (রাযিঃ)কেও জিজ্ঞাসা করিলেন তখন তিনি আরজ করিলেন যে, আমি আয়েশা সম্পর্কে ভালো ছাড়া কিছু জানি না। ইহা ছিল প্রকৃত দ্বীনদারী, নতুবা

সতীনকে বদনাম করার ও স্বামীর চোখে খাটো করার ইহা একটি সুযোগ ছিল। বিশেষ করিয়া ঐ সতীনকে যে স্বামীর নিকট সর্বাধিক প্রিয়ও ছিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও জোরালো ভাষায় তাহার পবিত্রতা বর্ণনা করিলেন এবং প্রশংসা করিলেন।

হযরত যয়নাব (রাযিঃ) অত্যন্ত বুযুর্গ ছিলেন। অধিক পরিমাণে রোযাও রাখিতেন, অধিক পরিমাণে নফল নামাযও পড়িতেন। নিজ হাতে উপার্জনও করিতেন এবং যাহা কিছু আয় হইত তাহা সদকা করিয়া দিতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময় বিবিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমাদের মধ্য হইতে সর্বপ্রথম কোন্ বিবি আপনার সহিত মিলিত হইবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাহার হাত লম্বা হইবে। তাহারা কাষ্ঠখণ্ড লইয়া হাত মাপিতে লাগিলেন। কিন্তু পরে বুঝিতে পারিলেন যে, হাত লম্বা হওয়ার অর্থ অধিক দান–খয়রাত করা ছিল। অতএব সর্বপ্রথম হযরত যয়নাব (রাযিঃ)এরই ইন্তিকাল হইল।

হযরত ওমর (রাযিঃ) যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণের জন্য ভাতা নির্ধারণ করিলেন এবং হযরত যয়নাব (রাযিঃ)এর নিকট তাহার অংশের বার হাজার দেরহাম পাঠাইলেন তখন তিনি মনে করিলেন যে, ইহা সবার জন্য দেওয়া হইয়াছে। তাই তিনি বলিতে লাগিলেন যে, বন্টন করার জন্য তো অন্যান্য বিবিগণ উপযুক্ত ছিলেন। বাহক বলিলেন, এইসব আপনার অংশ এবং সারা বছরের জন্য। তখন তিনি আশ্চর্য হইয়া বলিতে লাগিলেন সুবহানাল্লাহ! এবং কাপড় দ্বারা মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন যেন এই মাল দেখিতেও না হয়। অতঃপর বলিলেন, ঘরের কোণে রাখিয়া দাও এবং উহার উপর একটি কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দেওয়াইলেন। তারপর এই ঘটনার বর্ণনাকারী বারযা (রাযিঃ)কে বলিলেন, ইহা হইতে এক মুষ্টি অমুককে দিয়া আস, এক মুষ্টি অমুককে দিয়া আস। মোটকথা, এইভাবে আত্মীয়–স্বজন এবং গরীব ও বিধবাদের মধ্যে এক এক মুষ্টি করিয়া বন্টন করিয়া দিলেন। পরে যখন সামান্য পরিমাণ মাল অবশিষ্ট রহিয়া গেল তখন বারযা (রাযিঃ)ও আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, কাপড়ের নিচে যাহা রহিয়া গিয়াছে তাহা তুমি লইয়া যাও। বারযা (রাযিঃ) বলেন, যাহা অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছিল তাহা আমি লইয়া গণিয়া দেখিলাম চুরাশি দেরহাম ছিল। অতঃপর তিনি উভয় হাত তুলিয়া দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ! আগামী বৎসর যেন এই মাল আমার নিকট না আসে। কেননা ইহা ফেৎনার বস্তু। সুতরাং পরবর্তী বৎসরের ভাতা

আসিবার পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করিলেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) যখন জানিতে পারিলেন যে, ঐ বার হাজার দেরহাম শেষ করিয়া দিয়াছেন তখন তিনি আরও এক হাজার দেরহাম পাঠাইলেন, যাহাতে নিজের প্রয়োজনে খরচ করিতে পারেন। তিনি উহাও সঙ্গে সঙ্গে বন্টন করিয়া দিলেন। অনেক বেশী সচ্ছলতা সত্ত্বেও ইন্তেকালের সময় না কোন দেরহাম রাখিয়া গেলেন, না কোন সম্পদ? পরিত্যক্ত সম্পত্তি শুধু ঐ ঘরটি ছিল যাহাতে তিনি থাকিতেন। অধিক দান খয়রাত করিতেন বলিয়া তাঁহার উপাধি ছিল 'গরীবের আশ্রয়'। (তাবাকাত)

এক মহিলা বর্ণনা করেন, আমি হযয়ত যয়নাব (রাযিঃ)এর নিকট ছিলাম। আমরা গেরুয়া রঙ দ্বারা কাপড় রঙ করিতেছিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনিলেন। আমাদিগকে কাপড় রঙ করিতে দেখিয়া ফিরিয়া গেলেন। হযরত যয়নাব (রাযিঃ) মনে করিলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইহা অপছন্দ হইয়াছে, তাই যে সমস্ত কাপড় রঙ করা হইয়াছিল সঙ্গে সঙ্গে ধুইয়া ফেলিলেন। পরবর্তীতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আসিয়া দেখিলেন যে, সেই রঙের কোন দৃশ্য নাই তখন ভিতরে তশরীফ আনিলেন। (আবূ দাউদ)

ফায়দা ঃ মহিলাদের বিশেষ করিয়া ধন–সম্পদের উপর যতখানি মহব্বত হয় তাহা অজানা নহে, এমনিভাবে রঙ ইত্যাদির প্রতি আকর্ষণ সম্পর্কেও বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তাহারাও তো মহিলাই ছিলেন—যাহারা মাল সঞ্চয় করিয়া রাখা জানিতেনই না আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামান্য একটু ইশারা পাইয়া সমস্ত রঙ ধুইয়া ফেলিলেন।

(১১) চার পুত্রসহ হযরত খানসা (রাযিঃ)এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ

হযরত খানসা (রাযিঃ) বিখ্যাত কবি ছিলেন। স্বীয় গোত্রের কতিপয় লোকের সহিত মদীনায় আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, আলেমগণ এই বিষয়ে একমত যে, তাহার পূর্বে ও পরে কোন মহিলা তাহার চেয়ে সুন্দর কবিতা রচনা করেন নাই। হযরত ওমর (রাযিঃ)এর খেলাফতকালে ১৬ হিজরীতে কাদেসিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। খানসা (রাযিঃ) তাহার চার পুত্রসহ সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের একদিন পূর্বে ছেলেদেরকে বহু উপদেশ দিলেন এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিবার জন্য খুব বেশী উৎসাহিত করিলেন। বলিতে লাগিলেন, হে আমার

ছেলেরা! তোমরা নিজের খুশীতে মুসলমান হইয়াছ এবং নিজের খুশীতেই তোমরা হিজরত করিয়াছ। সেই যাতের কসম, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নাই, যেমনিভাবে তোমরা এক মায়ের সন্তান, অনুরূপভাবে এক পিতার সন্তান। আমি না তোমাদের পিতার সহিত খেয়ানত করিয়াছি আর না তোমাদের মামাদেরকে লজ্জিত করিয়াছি। না আমি তোমাদের মান-মর্যাদায় কোন কলঙ্ক লাগাইয়াছি। না তোমাদের বংশকে নষ্ট করিয়াছি। তোমরা জান যে, কাফেরদের মোকাবেলায় যুদ্ধ করার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের জন্য কি কি সওয়াব রাখিয়াছেন। তোমাদের ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, আখেরাতের অফুরন্ত জীবন দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের তুলনায় বহু গুণে উত্তম। আল্লাহ তায়ালার পবিত্র ইরশাদ— يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে ঈমানদারগণ! কষ্টে ধৈর্যধারণ কর এবং (কাফেরদের মোকাবিলায়) অটল থাক আর মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাক, আর আল্লাহকে ভয় কর যেন তোমরা সম্পূর্ণরূপে কামিয়াব হও।" (বঃ কুরআন)

অতএব আগামীকাল ভোরে যখন তোমরা সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় উঠিবে, তখন অতি সতর্কতার সহিত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিবে এবং আল্লাহর কাছে শত্রুর বিরুদ্ধে মদদ চাহিয়া অগ্রসর হইবে। আর যখন তোমরা দেখিবে যে, যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করিয়াছে এবং যুদ্ধের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে তখন সেই উত্তপ্ত আগুনের ভিতর ঢুকিয়া পড়িবে এবং কাফেরদের সর্দারের সহিত মোকাবিলা করিবে। ইনশাআল্লাহ সসম্মানে জান্নাতের মধ্যে কামিয়াব হইয়া থাকিবে।

সুতরাং সকালে যখন যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করিল তখন চার ছেলের প্রত্যেকে একের পর এক মায়ের উপদেশকে কবিতায় আবৃত্তি করতঃ জোশের সহিত সামনে অগ্রসর হইতেছিল। যখন একজন শহীদ হইয়া যাইতেছিল তখন অনুরূপভাবে আরেকজন অগ্রসর হইতেছিল এবং শহীদ হওয়া পর্যন্ত লড়িতেছিল। অবশেষে চারজনই শহীদ হইয়া গেল। মা যখন চারজনের মৃত্যুর সংবাদ পাইলেন তখন বলিলেন, আল্লাহর শোকর যিনি তাহাদের শাহাদতের দ্বারা আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন। আমি আল্লাহর নিকট আশা রাখি যে, এই চারজনের সহিত আমিও তাহার রহমতের ছায়ায় থাকিব। (উসদুল গাবাহ)

ফায়দা ঃ আল্লাহর বান্দীদের মধ্যে এমন মাও হইয়া থাকেন, যিনি

চারজন জোয়ান ছেলেকে যুদ্ধের প্রচণ্ডতা ও ভয়াবহতার মধ্যে ঢুকিয়া পড়ার উৎসাহ দান করেন। আর যখন চারজনেই শহীদ হইয়া যায় এবং একই সময় সকলে মৃত্যুবরণ করে তখন আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করেন।

(১২) হযরত সফিয়্যা (রাযিঃ) কর্তৃক একাই এক ইহুদীকে হত্যা করা

হযরত সফিয়্যা (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফু এবং হামযা (রাযিঃ)এর আপন বোন ছিলেন। উহুদের যুদ্ধে শরীক ছিলেন। মুসলমানরা যখন কিছুটা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইলেন এবং পলায়ন করিতে লাগিলেন, তখন তিনি তাহাদের মুখের উপর বর্শা মারিয়া তাহাদিগকে ফিরাইতেছিলেন। খন্দকের যুদ্ধে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মহিলাদিগকে একটি দূর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন আর হযরত হাস্‌সান ইবনে ছাবেত (রাযিঃ)কে পাহারাদার স্বরূপ সেখানে রাখিয়া গিয়াছিলেন। ভিতরের শত্রু ইহুদীদের জন্য ইহা ছিল বড় সুবর্ণ সুযোগ। একদল ইহুদী মহিলাদের উপর হামলা করার এরাদা করিল এবং এক ইহুদী অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য দুর্গের নিকট পৌঁছিল। হযরত সফিয়্যা (রাযিঃ) কোথাও হইতে দেখিতে পাইয়া হযরত হাস্‌সান (রাযিঃ)কে বলিলেন, এই ইহুদী সুযোগ খুঁজিতে আসিয়াছে। তুমি দুর্গের বাহিরে যাও এবং তাহাকে হত্যা কর। তিনি দুর্বল ছিলেন। দুর্বলতার কারণে তাঁহার সহাস হইল না। তখন হযরত সফিয়্যা (রাযিঃ) তাঁবুর একটি খুঁটি হাতে লইলেন এবং নিজেই বাহিরে যাইয়া ইহুদীর মাথা চূর্ণ করিয়া দিলেন। অতঃপর দুর্গে ফিরিয়া আসিয়া হযরত হাস্‌সানকে বলিলেন, যেহেতু ঐ ইহুদী পুরুষ ছিল এবং পরপুরুষ হওয়ার কারণে আমি তাহার সামান ও পোশাক খুলিয়া আনিতে পারি নাই, তুমি তাহার সব পোশাক খুলিয়া আন এবং তাহার মাথাও কাটিয়া আন। হযরত হাস্‌সান (রাযিঃ) দুর্বলতার কারণে ইহারও হিম্মত করিতে পারিলেন না। অতএব তিনি দ্বিতীয়বার গেলেন এবং তাহার মাথা কাটিয়া আনিলেন আর দেওয়ালের উপর দিয়া ইহুদীদের ভীড়ের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তাহারা ইহা দেখিয়া বলিতে লাগিল, আমরা তো আগে হইতেই ধারণা করিতেছিলাম যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহিলাদেরকে সম্পূর্ণ একা ছাড়িয়া যাইতে পারেন না, অবশ্যই তাহাদের পাহারাদার হিসাবে পুরুষলোক ভিতরে মওজুদ রহিয়াছে। (উসদুল গাবাহ)

ফায়দা ঃ ২০ হিজরীতে হযরত সফিয়্যা (রাযিঃ)এর ইন্তিকাল হয়।

ইন্তিকালের সময় তাঁহার বয়স ৭৩ বৎসর ছিল। খন্দকের যুদ্ধ হইয়াছে পঞ্চম হিজরীতে। সেই হিসাবে ঐ সময় তাঁহার বয়স ৫৮ বৎসর ছিল। আজকাল এই বয়সের মহিলাদের জন্য ঘরের কাজকর্ম করাই মুশকিল হইয়া পড়ে, একা একজন পুরুষকে হত্যা করা তো দূরের কথা, তাহাও আবার এমন অবস্থায় যে, একদিকে শুধু মহিলারা আর অপরদিকে ইহুদীদের বিরাট দল।

(১৩) হযরত আসমা (রাযিঃ) কর্তৃক মহিলাদের সওয়াব সম্পর্কে প্রশ্ন করা

আসমা বিনতে ইয়াযীদ আনসারী (রাযিঃ) একজন মহিলা সাহাবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উপর আমার পিতামাতা কোরবান হউন, আমি মুসলমান মেয়েদের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি হিসাবে আপনার খেদমতে হাজির হইয়াছি। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা আপনাকে পুরুষ ও নারী উভয়ের প্রতি নবী বানাইয়া পাঠাইয়াছেন। এইজন্য আমরা মহিলারা আপনার উপর ঈমান আনিয়াছি এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনিয়াছি। কিন্তু আমরা মহিলারা ঘরে আবদ্ধ থাকি, পর্দায় বন্দী থাকি। পুরুষদের ঘরে সঙ্গিনী হইয়া থাকি এবং পুরুষদের খায়েশ আমাদের দ্বারা পুরা করা হয়, আমরা তাহাদের সন্তানকে পেটে ধারণ করিয়া থাকি। কিন্তু এই সবকিছু সত্ত্বেও পুরুষরা বহু সওয়াবের কাজে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী থাকেন। তাহারা জুমআর নামাযে শরীক হন, জমাতের নামাযে শরীক হন, রোগীদের দেখাশোনা করেন, জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করেন। হজ্জের পর হজ্জ করিতে থাকেন। এই সবকিছুর চাইতে বড় কাজ তাহারা জেহাদ করিতে থাকেন। আর যখন তাহারা হজ্জ, ওমরা বা জেহাদের জন্য যান তখন আমরা মহিলারা তাহাদের মালের হেফাজত করি। তাহাদের জন্য কাপড় বুনি, তাহাদের সন্তানদের লালন পালন করি। এমতাবস্থায় আমরা কি তাহাদের সওয়াবের মধ্যে অংশীদার হইব না? ইহা শুনিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা দ্বীন সম্পর্কে এই মহিলার চাইতে কি উত্তম প্রশ্ন করিতে কাহাকেও শুনিয়াছ? সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন মহিলা এমন প্রশ্ন করিতে পারে বলিয়া আমাদের ধারণাও ছিল না। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমা (রাযিঃ)এর প্রতি

লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তুমি খুব মনোযোগের সহিত শোন এবং বুঝিয়া লও আর যে সকল মহিলারা তোমাকে পাঠাইয়াছে তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, মহিলাদের আপন স্বামীর সহিত উত্তম আচরণ করা, তাহার সন্তুষ্টি তালাশ করা এবং তদনুযায়ী আমল করা ঐ সব আমলের সওয়াবের সমান। আসমা (রাযিঃ) এই উত্তর শুনিয়া অতি আনন্দের সহিত ফিরিয়া গেলেন। (উসদুল গাবাহ)

ফায়দা ঃ মহিলাদের আপন স্বামীর সহিত উত্তম আচরণ করা, তাহাদের অনুগত হইয়া চলা ও হুকুম পালন করা অতি মূল্যবান বিষয়। কিন্তু মহিলারা ইহা হইতে অত্যন্ত গাফেল।

একবার সাহাবায়ে কেরাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন যে, অনারব লোকেরা তাহাদের বাদশাহ এবং সর্দারদেরকে সেজদা করে। আপনি ইহার বেশী উপযুক্ত যে, আমরা আপনাকে সেজদা করি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিলেন এবং এরশাদ ফরমাইলেন, আমি যদি আল্লাহ ছাড়া আর কাহাকেও সেজদার আদেশ করিতাম তবে মহিলাদেরকে হুকুম করিতাম যেন তাহারা তাহাদের স্বামীদেরকে সেজদা করে। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, ঐ জাতের কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ, কোন মহিলা আপন রবের হক ঐ পর্যন্ত আদায় করিতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামীর হক আদায় না করিবে।

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, একটি উট আসিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেজদা করিল। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, যখন এই পশু আপনাকে সেজদা করিতেছে। তখন আমরা আপনাকে সেজদা করিবার বেশী উপযুক্ত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিলেন এবং ইহা–ই বলিলেন যে, আমি যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও সেজদা করিবার আদেশ করিতাম তবে স্ত্রীলোককে হুকুম করিতাম তাহার স্বামীকে সেজদা করিতে।

এক হাদীসে আসিয়াছে, যে মহিলা এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, স্বামী তাহার প্রতি সন্তুষ্ট, সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

এক হাদীসে আছে, স্ত্রী যদি স্বামীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া আলাদা রাত্রি যাপন করে তবে ফেরেশতারা তাহার উপর লা'নত করিতে থাকে।

এক হাদীসে আছে, দুই ব্যক্তির নামায কবুল হওয়ার জন্য আসমানের দিকে মাথার উপর অতিক্রম করে না—একজন হইল, আপন মনিব হইতে পলাতক গোলাম। অপরজন হইল, ঐ মহিলা যে স্বামীর নাফরমানী করে।

(১৪) হযরত উম্মে উমারা (রাযিঃ)এর ইসলাম ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ

হযরত উম্মে উমারা আনসারিয়া (রাযিঃ) ঐ সকল মহিলাদের মধ্যে যাহারা ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমান হইয়াছেন এবং বাইয়াতে আকাবায় শরীক হইয়াছেন। 'আকাবা' অর্থ গিরিপথ। প্রথমতঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপনে মুসলমান করিতেন। কারণ কাফের ও মুশরিকরা নতুন মুসলমানদেরকে কঠিন কষ্ট দিত। মদীনার কিছু লোক হজ্জের সময় আসিত এবং মীনার একটি গিরিপথে গোপনে মুসলমান হইত। তৃতীয় দফায় যাহারা মদীনা হইতে আসিলেন তাহাদের মধ্যে তিনিও ছিলেন। হিজরতের পর যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হইল তখন তিনি অধিকাংশ যুদ্ধে শরীক হইয়াছেন। বিশেষ করিয়া উহুদ, হুদাইবিয়া, খাইবার, ওমরাতুল কাযা, হুনাইন এবং ইয়ামামার যুদ্ধে। উহুদের যুদ্ধের ঘটনা নিজেই বর্ণনা করেন যে, আমি মুসলমানদের অবস্থা দেখিবার জন্য পানির মশক ভরিয়া উহুদের দিকে চলিলাম। যদি কোন পিপাসিত এবং আহত ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাই তবে পানি পান করাইব। ঐ সময় তাহার বয়স ৪৩ বৎসর ছিল। তাঁহার স্বামী এবং দুইপুত্রও যুদ্ধে শরীক ছিলেন। মুসলমানদের বিজয় হইতেছিল কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে যখন কাফেরদের বিজয় প্রকাশ হইতে লাগিল তখন আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিয়া গেলাম এবং যে কোন কাফের এইদিকে আসিত তাহাকে হটাইয়া দিতাম। প্রথম দিকে তাঁহার নিকট ঢালও ছিল না, পরে একটি ঢাল পাইলেন যাহা দ্বারা কাফেরদের হামলা প্রতিহত করিতেন। কোমরে একটি কাপড় বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন যাহার মধ্যে বিভিন্ন রকমের কাপড়ের টুকরা ভর্তি ছিল। যখন কেহ আহত হইত একটি টুকরা বাহির করিয়া জ্বালাইয়া জখমে ভরিয়া দিতেন। তাহার নিজেরও বার তের জায়গায় জখম হয়, তন্মধ্যে একটি জখম মারাত্মক ছিল। উম্মে সাঈদ (রাযিঃ) বলেন, আমি তাঁহার কাঁধে একটি গভীর ক্ষত দেখিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কিভাবে হইয়াছিল? বলিতে লাগিলেন, উহুদের যুদ্ধে যখন লোকেরা পেরেশান হইয়া এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিতেছিল তখন ইবনে কামিয়্যা এই বলিয়া অগ্রসর হইল যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোথায় আছে, কেহ আমাকে দেখাইয়া দাও। সে যদি আজ বাঁচিয়া যায় তবে আমার রক্ষা নাই। মুসআব ইবনে উমাইর (রাযিঃ) এবং আরো কয়েকজন লোক তাহার মুকাবিলায় আসিয়া গেলেন। আমিও তাহাদের মধ্যে ছিলাম। সে আমার কাঁধের উপর আঘাত করিল, আমিও তাহার উপর কয়েকবার আঘাত করিলাম। কিন্তু

তাহার শরীরে দুই পাল্লা বর্ম ছিল। এইজন্য বর্মের উপর আঘাত ব্যর্থ হইয়া যাইত। এই ক্ষত এত মারাত্মক ছিল যে, পূর্ণ এক বৎসর পর্যন্ত চিকিৎসা করিবার পরও ভাল হয় নাই। ঐ সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামরাউল-আসাদ যুদ্ধের ঘোষণা দিয়া দিলেন। উম্মে উমারা (রাযিঃ)ও কোমর বাধিয়া তৈয়ার হইয়া গেলেন কিন্তু যেহেতু পূর্বের জখম সম্পূর্ণ তাজা ছিল, এই কারণে শরীক হইতে পারিলেন না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হামরাউল আসাদ হইতে ফিরিয়া আসিলেন তখন সর্বপ্রথম উম্মে উমারা (রাযিঃ)এর কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সুস্থ আছেন জানিয়া খুবই খুশী হইলেন। উক্ত জখম ছাড়াও উহুদের যুদ্ধে আরো বহু জখম হইয়াছিল। উম্মে উমারা (রাযিঃ) বলেন, আসলে তাহারা ছিল ঘোড়সওয়ার আর আমরা ছিলাম পদাতিক। তাহারাও যদি আমাদের মত পদাতিক হইত তবেই তো সত্যিকার অর্থে মোকাবেলা কাহাকে বলে বুঝিতে পারিত। যখন ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া কেউ আসিত এবং আমার উপর আঘাত করিত তখন আমি ঢালের সাহায্যে তাহার আঘাত ফিরাইতে থাকিতাম। আর যখন সে আমার দিক হইতে অন্যদিকে ফিরিয়া যাইত তখন আমি ঘোড়ার পায়ের উপর আঘাত করিতাম এবং ঘোড়ার পা কাটিয়া যাইত। ইহাতে ঘোড়াও পড়িয়া যাইত, আরোহী ব্যক্তিও পড়িয়া যাইত। যখন সে পড়িয়া যাইত তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সাহায্য করার জন্য আমার ছেলেদেরকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। আমি এবং তাহারা উভয়ে মিলিয়া তাহাকে শেষ করিয়া দিতাম।

উম্মে উমারা (রাযিঃ) এর পুত্র আবদুল্লাহ বিন যায়েদ (রাযিঃ) বলেন, আমার বাম বাহুতে আঘাত লাগিল এবং রক্ত বন্ধ হইতেছিল না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উহাতে পট্টি বাঁধিয়া দাও। আমার মা আসিয়া তাহার কোমর হইতে কিছু কাপড় বাহির করিয়া পট্টি বাঁধিলেন এবং পট্টি বাঁধিয়াই বলিতে লাগিলেন, কাফেরদের সহিত মোকাবিলা কর। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। অতঃপর বলিতে লাগিলেন, হে উম্মে উমারা! তোমার মত এত সাহস কাহার আছে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সময় তাঁহার ও তাঁহার পরিবারের জন্য কয়েকবার দোয়াও করিলেন এবং প্রশংসাও করিলেন। উম্মে উমারা (রাযিঃ) বলেন, ঐ মুহূর্তে এক কাফের সামনে আসিল, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, এই সেই ব্যক্তি, যে তোমার ছেলেকে আহত করিয়াছে। আমি

অগ্রসর হইলাম এবং তাহার পায়ের গোছার উপর আঘাত করিলাম। ইহাতে সে আহত হইয়া সাথে সাথে বসিয়া পড়িল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসিলেন এবং বলিলেন, ছেলের প্রতিশোধ নিয়া নিলে। অতঃপর আমরা অগ্রসর হইয়া তাহাকে শেষ করিয়া দিলাম।

উম্মে উমারা (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাদের জন্য দোয়া করিলেন, তখন আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দোয়া করুন আল্লাহ তায়ালা যেন জান্নাতে আপনার সঙ্গ নসীব করেন। যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার জন্য দোয়া করিলেন তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, দুনিয়াতে আমার উপর কি মুসীবত গিয়াছে, আমি এখন আর উহার কোন পরওয়া করি না।

উহুদ ছাড়াও তিনি আরো কয়েকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছেন এবং বীরত্ব দেখাইয়াছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর মুর্তাদ হওয়ার হিড়িক পড়িয়া গেল এবং ইয়ামামায় প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। উহাতে উম্মে উমারা (রাযিঃ) শরীক ছিলেন। সেই যুদ্ধে তাঁহার একটি হাতও কাটিয়া গিয়াছিল। ইহাছাড়াও শরীরে এগারটি জখম হইয়াছিল। আর ঐ জখম লইয়াই তিনি মদীনা তাইয়্যেবায় পৌছিলেন। (তাবাকাত)

ফায়দা ঃ ইহা একজন মহিলার বীরত্ব, যাহার বয়স উহুদের যুদ্ধের সময় ছিল তেতাল্লিশ বছর। যেমন পূর্বে বলা হইয়াছে। আর ইয়ামামার যুদ্ধের সময় তাহার বয়স প্রায় বায়ান্ন বছর। এই বয়সে এত যুদ্ধে এই রকম বীরত্বের সহিত অংশগ্রহণ করা কারামতই বলা যাইতে পারে।

(১৫) হযরত উম্মে হাকীম (রাযিঃ)এর ইসলাম ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ

উম্মে হাকীম বিনতে হারেস (রাযিঃ) যিনি ইকরিমা ইবনে আবু জাহলের স্ত্রী ছিলেন এবং কাফেরদের পক্ষ হইতে উহুদের যুদ্ধেও শরীক হইয়াছিলেন। যখন মক্কা মুকাররমা বিজয় হয় তখন মুসলমান হইয়া যান। স্বামীর সহিত অত্যন্ত ভালবাসা ছিল কিন্তু তিনি তাহার পিতার প্রভাবের কারণে ইসলাম গ্রহণ করেন নাই এবং যখন মক্কা বিজয় হয় তখন ইয়ামন পালাইয়া গিয়াছিলেন। উম্মে হাকীম (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাহার স্বামীর জন্য নিরাপত্তা চাহিলেন এবং নিজে ইয়ামন পৌছিলেন এবং স্বামীকে বহু কষ্টে মদীনায় আসিতে রাজী করিলেন। বলিলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরবারি হইতে তাঁহার আঁচলেই আশ্রয় মিলিতে পারে। তুমি আমার সহিত চল। তিনি মদীনা তাইয়্যেবায় ফিরিয়া আসিয়া মুসলমান

হইলেন এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সুখে-শান্তিতে রহিলেন। পরে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর খেলাফত আমলে যখন রোমের যুদ্ধ হইল তখন সেই যুদ্ধে ইকরিমা (রাযিঃ) শরীক হইলেন এবং তাহার স্ত্রীও সাথে ছিলেন। হযরত ইকরিমা (রাযিঃ) এই যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। অতঃপর খালেদ ইবনে সাঈদ (রাযিঃ) উম্মে হাকীম (রাযিঃ)কে বিবাহ করেন এবং ঐ সফরেই মারজুস-সাফফার নামক স্থানে বাসর যাপন করিতে চাহিলে উম্মে হাকীম (রাযিঃ) বলিলেন, এখনও শত্রুদের ভিড় রহিয়াছে ইহা শেষ হইতে দিন। স্বামী বলিলেন, এই যুদ্ধে আমার শহীদ হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে। ইহাতে তিনিও চুপ হইয়া গেলেন। অতঃপর সেখানেই এক মঞ্জিলে তাঁবুর ভিতর বাসর যাপন হইল। সকালে অলীমার আয়োজন মাত্র হইতেছিল এমন সময় রোম বাহিনী হামলা করিল। প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। উহাতে খালেদ ইবনে সাঈদ (রাযিঃ) শহীদ হইলেন। উম্মে হাকীম (রাযিঃ) ঐ তাঁবুটি খুলিয়া ফেলিলেন যাহাতে রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন এবং নিজের সমস্ত আসবাবপত্র বাঁধিলেন আর তাঁবুর খুঁটি লইয়া নিজেও মোকাবিলা করিলেন এবং একাই সাতজনকে হত্যা করিলেন। (উসদুল গাবাহ)

ফায়দা ঃ আমাদের যমানার কোন মহিলা তো দূরের কথা কোন পুরুষও এই রকম সময় বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইত না। আর যদি বিবাহ হইয়াও যাইত তবে নাজানি এইভাবে হঠাৎ শহীদ হইয়া যাওয়ার কারণে কাঁদিতে কাঁদিতে কত দিন শোকে কাটাইয়া দিত। আল্লাহর এই বান্দী নিজেও জেহাদ শুরু করিয়া দিলেন এবং মহিলা হইয়াও সাতজনকে হত্যা করিলেন।

(১৬) হযরত সুমাইয়্যা উম্মে আম্মার (রাযিঃ)-এর শাহাদত

সুমাইয়্যা বিনতে খাইয়্যাত হযরত আম্মার (রাযিঃ)-এর মাতা ছিলেন। তাঁহার ঘটনা প্রথম অধ্যায়ের ৭নং কাহিনীতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনিও তাহার পুত্র আম্মার (রাযিঃ) স্বামী হযরত ইয়াসির (রাযিঃ)এর মত ইসলামের খাতিরে বহু কষ্ট-নির্যাতন ভোগ করিতেন। কিন্তু ইসলামের প্রকৃত মহব্বত যাহা অন্তরে বসিয়া গিয়াছিল উহাতে সামান্যতমও ব্যতিক্রম হইত না। তাঁহাকে প্রচণ্ড গরমের সময় রৌদ্রের মধ্যে কংকরের উপর ফেলিয়া রাখা হইত। লোহার পোশাক পরাইয়া রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া রাখা হইত যাহাতে রৌদ্রে লোহা গরম হইতে থাকে আর উহার গরমে কষ্ট আরো বেশী হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঐ পথে

যাইতেন তখন সবরের উপদেশ দিতেন এবং জান্নাতের ওয়াদা করিতেন।

একবার হযরত সুমাইয়্যা (রাযিঃ) দাঁড়াইয়া ছিলেন। আবু জাহল তাঁহার নিকট দিয়া যাইতেছিল। সে তাঁহাকে গালি-গালাজ করিল এবং রাগান্বিত হইয়া তাঁহার লজ্জাস্থানে বর্শা মারিল। যাহার আঘাতে তিনি ইন্তেকাল করিলেন। ইসলামের খাতিরে সর্বপ্রথম তিনিই শাহাদত বরণ করেন। (উসদুল গাবাহ)

ফায়দা ঃ মহিলাদের এই পরিমাণ ধৈর্য হিম্মত ও দৃঢ়তা ঈর্ষাযোগ্য বিষয়। আসল ব্যাপার হইল, যখন মানুষের অন্তরে কোন বিষয় বসিয়া যায়, তখন তাহার জন্য সব কিছু সহজ হইয়া যায়। এখনও প্রেম ও ভালবাসার এমন বহু ঘটনা শুনা যায় যে, উহার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে। কিন্তু এই প্রাণ বিসর্জন দেওয়া যদি আল্লাহর রাস্তায় হয়, দ্বীনের খাতিরে হয় তবে পরবর্তী জীবনে যাহা মৃত্যুর পরেই শুরু হইয়া যাইবে, সম্মান ও সফলতার কারণ হইবে। আর যদি দুনিয়ার কোন স্বার্থে হয় তবে দুনিয়া তো গেলই, আখেরাতও বরবাদ হইল।

(১৭) হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাযিঃ)-এর জীবন-যাপন ও অভাব-অনটন

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাযিঃ) যিনি হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর কন্যা, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ)এর মাতা এবং হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর সৎ বোন ছিলেন। প্রসিদ্ধ মহিলা সাহাবিয়াগণের মধ্যে ছিলেন। শুরুতেই মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি সতেরজনের পর মুসলমান হইয়াছিলেন। হিজরতের সাতাইশ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) হিজরত করিয়া মদীনা তাইয়্যেবায় পৌছিয়া গেলেন তখন হযরত যায়েদ (রাযিঃ) সহ কয়েকজনকে মক্কা হইতে উভয়ের পরিবারের লোকজনকে লইয়া আসার জন্য পাঠাইলেন। তাহাদের সহিত হযরত আসমা (রাযিঃ)ও চলিয়া আসিলেন। যখন কুবায় পৌছিলেন তখন আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ)এর জন্ম হয়। হিজরতের পর সর্বপ্রথম তাঁহারই জন্ম হয়। তখনকার সময়ের ব্যাপক দরিদ্রতা ও অভাব-অনটন যেমনই প্রসিদ্ধ ছিল তেমনি সেই যুগের হিম্মত কষ্ট সহিষ্ণুতা বীরত্ব সাহসিকতাও নজীরবিহীন ছিল।

বুখারী শরীফে হযরত আসমা (রাযিঃ)এর জীবন ধারণের অবস্থা তিনি নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, যুবাইরের সহিত যখন আমার

বিবাহ হইল তখন তাঁহার নিকট না মাল ছিল, না বিষয় সম্পত্তি, না কোন কাজের লোক ছিল, না অন্য কোন জিনিস। একটি উট ছিল পানি বহন করিয়া আনিবার জন্য, আর একটি ঘোড়া ছিল। আমিই উটের জন্য ঘাস ইত্যাদি যোগাড় করিয়া আনিতাম এবং খেজুরের বীচি চূর্ণ করিয়া খাদ্য হিসাবে খাওয়াইতাম। আমি নিজেই পানি বহন করিয়া আনিতাম এবং পানির ডোল ফাটিয়া গেলে নিজেই উহা সেলাই করিতাম। আর নিজেই ঘোড়ার খেদমত ঘাস, খাদ্য ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতাম। ঘরের সমস্ত কাজকর্মও নিজেই করিতাম। এই সব কাজের মধ্যে ঘোড়ার দেখাশুনা ও খেদমতই আমার জন্য বেশী কষ্টকর ছিল। রুটি অবশ্য আমি ভালরূপে তৈরী করিতে জানিতাম না। আটা খামির করিয়া প্রতিবেশী আনসারী মহিলাদের নিকট লইয়া যাইতাম। তাহারা অত্যন্ত সহানুভূতিশীল মহিলা ছিলেন। তাহারা আমার রুটিও তৈরী করিয়া দিতেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় পৌছিয়া যুবাইর (রাযিঃ)কে একখণ্ড জমিন জায়গীর স্বরূপ দান করিলেন। উহা প্রায় দুই মাইল দূরে ছিল। আমি সেখান হইতে খেজুরের বীচি মাথায় বহন করিয়া লইয়া আসিতাম। একবার আমি এইভাবে বোঝা মাথায় করিয়া আসিতেছিলাম, পথিমধ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি উটের উপর আরোহণ করিয়া আসিতেছিলেন। আনসারদের একটি দল সঙ্গে ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখিয়া উট থামাইলেন এবং উহাকে বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন, যাহাতে আমি উহার উপর আরোহণ করি। পুরুষদের সহিত যাইতে আমার লজ্জাবোধ হইল। আর ইহাও মনে পড়িল যে, যুবাইর (রাযিঃ)এর আত্মমর্যাদাবোধ অনেক বেশী—তাহার নিকটও হয়ত ইহা অপছন্দনীয় হইবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাবভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, আমি উহার উপর আরোহণ করিতে লজ্জাবোধ করিতেছি, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলিয়া গেলেন। আমি ঘরে আসিলাম, যুবাইর (রাযিঃ)কে ঘটনা শুনাইলাম যে, এইভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় এবং ইহাও বলিলেন যে, আমার লজ্জাবোধ হইল আর তোমার আত্মমর্যাদাবোধের কথাও মনে পড়িল। যুবাইর (রাযিঃ) বলিলেন, খোদার কসম, তোমার খেজুরের বীচির বোঝা মাথায় বহন করা আমার কাছে উহার চাইতেও বেশী কষ্টদায়ক। (কিন্তু ইহা অপারগতার কারণে ছিল। কেননা তাঁহারা অধিকাংশ সময় জেহাদে এবং অন্যান্য দ্বীনিকাজে ব্যস্ত

থাকিতেন এই জন্যই সাধারণতঃ মেয়েলোকদেরকেই ঘরের কাজকর্ম করিতে হইত।)

ইহার পর আমার পিতা আবু বকর (রাযিঃ) আমার জন্য একজন খাদেম যাহা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন, পাঠাইয়া দিলেন। ফলে ঘোড়ার খেদমত হইতে আমি রেহাই পাইলাম, মনে হইল যেন কঠিন বন্দীদশা হইতে আমি মুক্ত হইয়া গেলাম। (বুখারী, ফাতহুল বারী)

ফায়দা ঃ প্রাচীনকালেও আরবের নিয়ম ছিল এবং এখনও রহিয়াছে যে, তাহারা খেজুরের দানা চূর্ণ করিয়া অথবা যাঁতায় পিষিয়া পানিতে ভিজাইয়া খাদ্য হিসাবে পশুকে খাওয়াইয়া থাকে।

(১৮) হিজরতের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর সমস্ত মাল লইয়া যাওয়া এবং হযরত আসমা (রাযিঃ)এর নিজের দাদাকে সান্ত্বনা দান করা

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর হিজরতের সময় যেহেতু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সঙ্গে ছিলেন সেহেতু তিনি পথিমধ্যে প্রয়োজন হইতে পারে মনে করিয়া পাঁচ ছয় হাজার দেরহাম পরিমাণ যাহা ঐ সময় মওজুদ ছিল সমুদয় মাল সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। তাহাদের চলিয়া যাওয়ার পর হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর অন্ধ পিতা যিনি তখনও মুসলমান হইয়াছিলেন না, নাতনীদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আসিলেন এবং আফসোস করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, আমার ধারণা হয় যে, আবু বকর (রাযিঃ) তাহার চলিয়া যাওয়ার ব্যথাও তোমাদেরকে দিয়া গিয়াছে এবং সম্ভবতঃ সমস্ত মালও লইয়া গিয়াছে। ইহা আরেকটি কষ্ট তোমাদের উপর চাপাইয়া গিয়াছে।

আসমা (রাযিঃ) বলেন, আমি বলিলাম, না দাদা, আব্বা তো বহু কিছু রাখিয়া গিয়াছেন। এই বলিয়া আমি ছোট ছোট পাথর জমা করিয়া ঘরের ঐ তাকের মধ্যে ভরিলাম যেখানে আবু বকর (রাযিঃ)এর দেরহামসমূহ পড়িয়া থাকিত। তারপর ঐগুলি একটি কাপড় বিছাইয়া দিয়া ঐ কাপড়ের উপর দাদার হাত রাখিয়া দিলাম যাহা দ্বারা তিনি অনুমান করিলেন যে, তাকটি দেরহামে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। তিনি বলিতে লাগিলেন, যাহা হউক ইহা সে ভাল করিয়াছে। তোমাদের চলার ব্যবস্থা ইহা দ্বারা হইয়া যাইবে। আসমা (রাযিঃ) বলেন, খোদার কসম, তিনি কিছুই রাখিয়া গিয়াছিলেন না, কিন্তু আমি দাদার সান্ত্বনার জন্য এই পন্থা

অবলম্বন করিয়াছিলাম যাহাতে তিনি উহার কারণে মনক্ষুন্ন না হন।

(মুসনাদে আহমদ)

ফায়দা ঃ ইহা ছিল হিম্মত ও মনোবলের বিষয় ; নতুবা দাদার তুলনায় ঐ মেয়েদেরই বেশী ব্যথিত হওয়ার কথা ছিল আর ঐ মুহূর্তে দাদার কাছে যতই অভিযোগ করিত উহা যুক্তিসঙ্গত ছিল। কেননা ঐ সময় বাহ্যিকভাবে তাহার উপরই নির্ভরশীল ছিল এবং দৃশ্যত তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করারও যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। কারণ, একে তো পিতার বিচ্ছেদ দ্বিতীয়তঃ বাহ্যিক দৃষ্টিতে জীবন ধারণের কোন ব্যবস্থাও নাই। উপরন্তু মক্কাবাসীরা সকলে শত্রু ও নিঃসম্পর্ক। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাহাদের পুরুষ হউক বা মহিলা এক একটি গুণ এমন দান করিয়াছিলেন যাহা ঈর্ষা করার মতই ছিল।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) প্রথমে অত্যন্ত ধনী এবং অনেক বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু ইসলাম এবং আল্লাহর পথে এমন খরচ করিয়াছেন যে, তবুকের যুদ্ধে ঘরে যাহা কিছু ছিল সবকিছুই আনিয়া দিয়াছিলেন। যেমন ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্থ নম্বর ঘটনায় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই জন্যই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি কাহারো মাল দ্বারা এত উপকৃত হই নাই যত আবু বকরের মাল দ্বারা উপকৃত হইয়াছি। আমি সকলের এহসান ও উপকারের বিনিময় দিয়াছি কিন্তু আবু বকরের এহসানের বিনিময় আল্লাহ তায়ালাই দিবেন।

(১৯) হযরত আসমা(রাযিঃ)এর দানশীলতা

হযরত আসমা (রাযিঃ) বড় দানশীলা ছিলেন। প্রথমে তিনি যাহা কিছু খরচ করিতেন আনুমানিক হিসাব করিয়া খরচ করিতেন, কিন্তু যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন যে, বাঁধিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া দিবে না এবং হিসাব করিবে না সামর্থ্যানুযায়ী খরচ করিতে থাক। তারপর খুব খরচ করিতে লাগিলেন। তিনি আপন কন্যাদিগকে এবং ঘরের অন্যান্য মহিলাদেরকে উপদেশ দিতেন যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিতে এবং সদকা করিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়ার এবং বাঁচিয়া যাওয়ার অপেক্ষা করিও না। যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়ার অপেক্ষা করিতে থাক তবে তাহা কখনও হইবার নহে। (কেননা প্রয়োজন স্বয়ং বাড়িতে থাকে।) আর যদি সদকা করিতে থাক তবে সদকার মধ্যে খরচ করিয়া দেওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত থাকিবে না। (তাবাকাত)

ফায়দা ঃ এই সকল ব্যক্তির যত অভাব ও দরিদ্রতা ছিল ততই

দান-খয়রাত এবং আল্লাহর পথে খরচ করিবার ব্যাপারে উদারতা ও প্রশস্ততা ছিল। আজকাল মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে অভাব-অনটনের অভিযোগ শোনা যায়। কিন্তু এমন কোন দল কি পাওয়া যাইবে, যাহারা পেটে পাথর বাঁধিয়া জীবন ধারণ করে অথবা তাহাদের উপর একাধারে কয়েক দিন ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাটিয়া যায়?

(২০) হুযূর (সাঃ)এর কন্যা হযরত যয়নাব (রাযিঃ)এর হিজরত ও ইন্তেকাল

দোজাহানের সরদার হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়েদের মধ্যে সবার বড় হযরত যয়নাব (রাযিঃ) নবুওতের দশ বছর পূর্বে যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ত্রিশ বছর ছিল জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর খালাত ভাই আবুল আস ইবনে রবী-এর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। হিজরতের সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যাইতে পারেন নাই। তাঁহার স্বামী বদরের যুদ্ধে কাফেরদের সহিত অংশগ্রহণ করে এবং বন্দী হয়। মক্কাবাসীরা যখন তাহাদের বন্দীদিগকে মুক্ত করিবার জন্য মুক্তিপণ পাঠায় তখন হযরত যয়নাব (রাযিঃ)ও তাহার স্বামীর মুক্তির জন্য মাল পাঠান। তন্মধ্যে ঐ হারটিও ছিল যাহা হযরত খাদীজা (রাযিঃ) মেয়েকে যৌতুক স্বরূপ দিয়াছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উহা দেখিলেন তখন হযরত খাদীজা (রাযিঃ)এর স্মৃতি মনে পড়িয়া গেল এবং তাহার চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া গেল। অতঃপর সাহাবা (রাযিঃ)দের সহিত পরামর্শক্রমে এই সিদ্ধান্ত হইল যে, আবুল আসকে বিনা মুক্তিপণে এই শর্তে ছাড়িয়া দিয়া দেওয়া হইবে যে, সে ফিরিয়া যাইয়া যয়নাব (রাযিঃ)কে মদীনা তাইয়্যেবায় পাঠাইয়া দিবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যয়নাবকে আনিবার জন্য দুইজন লোককে সঙ্গে করিয়া দিলেন যে, তাহারা মক্কার বাহিরে অবস্থান করিবে আর আবুল আস যয়নাবকে তাহাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিবে।

সুতরাং হযরত যয়নাব (রাযিঃ) তাহার দেবর কেনানার সহিত উটের উপর আরোহণ করিয়া রওয়ানা হইলেন। কাফেররা যখন ইহা জানিতে পারিল তখন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। একদল বাধা দেওয়ার জন্য পৌঁছিয়া গেল। যাহাদের মধ্যে হযরত খাদীজা (রাযিঃ)এর চাচাত ভাইয়ের ছেলে হুবার ইবনে আসওয়াদ ছিল। এই হিসাবে হযরত যয়নাব (রাযিঃ)এর ভাই হইল। সে এবং তাহার সহিত আরো এক ব্যক্তি ছিল। তাহাদের উভয়ের

মধ্য হইতে কোন একজন আর অধিকাংশের মতে হুবার হযরত যয়নাব (রাযিঃ)কে বর্শা নিক্ষেপ করিল যাহার ফলে তিনি আহত হইয়া উট হইতে পড়িয়া গেলেন। যেহেতু তিনি গর্ভবতী ছিলেন এই কারণে গর্ভপাতও হইয়া গেল। কেনানা তীরের সাহায্যে মোকাবেলা করিল। আবু সুফিয়ান তাঁহাকে বলিল, দেখ, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর কন্যা হইয়া এইভাবে প্রকাশ্যে চলিয়া যাইবে ইহা বরদাশত করিবার মত নয়। এখন ফিরিয়া যাও অন্য সময় গোপনে পাঠাইয়া দিও। কেনানা মানিয়া নিল এবং ফিরিয়া আসিল। দুই-একদিন পর আবার রওয়ানা হইলেন। হযরত যয়নাব (রাযিঃ)এর এই জখম কয়েক বৎসর পর্যন্ত থাকিল এবং কয়েক বৎসর ইহাতে অসুস্থ থাকিয়া ৮ম হিজরীতে ইন্তিকাল করিলেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে, সে আমার সবচেয়ে ভাল মেয়ে ছিল। কারণ, আমার মহব্বতের কারণে নির্যাতন ভোগ করিয়াছে। দাফনের সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং কবরে নামিলেন এবং দাফন করিলেন। কবরে নামিবার সময় তিনি অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত ছিলেন। যখন উঠিয়া আসিলেন তখন চেহারা উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যয়নাবের দুর্বলতার ব্যাপারে আমার চিন্তা ছিল। আমি দোয়া করিলাম, কবরের সংকীর্ণতা ও কঠোরতা হইতে যেন তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। আল্লাহ তায়ালা তাহা কবুল করিয়াছেন। (খামীস)

ফায়দা ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে ; আবার দ্বীনের খাতিরে এত কষ্ট উঠাইলেন যে, ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণও করিলেন তারপরও কবরের সংকীর্ণতা হইতে মুক্তির জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়ার প্রয়োজন হইল। সেই ক্ষেত্রে আমাদের তো প্রশ্নই উঠে না! এইজন্য মানুষকে অধিকাংশ সময় কবরের আযাব হইতে মুক্তির জন্য দোয়া করা উচিত। স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে অধিকাংশ সময় কবরের আযাব হইতে পানাহ চাহিতেন। হে আল্লাহ! আমাদিগকে আপন অনুগ্রহে কবরের আযাব হইতে রক্ষা করুন।

(২১) হযরত রুবাইয়্যি বিনতে মুওয়াওয়েজ (রাযিঃ)-এর দ্বীনী মর্যাদাবোধ

রুবাইয়্যি বিনতে মুওয়াওয়েজ (রাযিঃ) একজন আনসারী মহিলা সাহাবিয়া ছিলেন। অধিকাংশ যুদ্ধে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের সহিত অংশগ্রহণ করিয়াছেন। আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করিতেন এবং নিহত ও শহীদদের লাশ উঠাইয়া আনিতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের পূর্বে মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন। হিজরতের পর তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের দিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁহার ঘরে গিয়াছিলেন। সেখানে কয়েকটি বালিকা আনন্দ ও খুশিতে কবিতা পাঠ করিতেছিল উহাতে আনসারদের ইসলামী কৃতিত্ব ও তাহাদের বড়দের আলোচনা ছিল যাহারা বদরের যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একজন এই চরণও পাঠ করিল— وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ অর্থাৎ, আমাদের মাঝে এমন একজন নবী রহিয়াছেন, যিনি ভবিষ্যতের কথা জানেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা পড়িতে নিষেধ করিয়া দিলেন। কারণ ভবিষ্যতের বিষয় একমাত্র আল্লাহ তায়ালা জানেন।

রুবাইয়্যি (রাযিঃ)এর পিতা মুয়াওয়েয আবু জাহলের হত্যাকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন। আসমা নাম্নী এক মহিলা যে আতর বিক্রয় করিত। সে একবার আরো কয়েকজন মহিলাকে সঙ্গে লইয়া হযরত রুবাইয়্যি (রাযিঃ)-এর বাড়ীতে গেল এবং মহিলাদের অভ্যাস অনুযায়ী সে তাহার নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিয়া দিলেন। তাহার পিতার নাম শুনিয়া সে বলিতে লাগিল, আচ্ছা, তুমি আপন সরদারের হত্যাকারীর মেয়ে? যেহেতু আবু জাহলকে আরবদের সরদার গণ্য করা হইত এইজন্য আপন সরদারের হত্যাকারী বলিয়াছে। এই কথা শুনিয়া রুবাইয়্যি (রাযিঃ)এর রাগ উঠিয়া গেল এবং বলিতে লাগিলেন যে, আমি আপন গোলামের হত্যাকারীর মেয়ে। আবু জাহলকে আপন পিতার সরদার বলিতে শুনিয়া রুবাইয়্যি (রাযিঃ)এর আত্মমর্যাদাবোধে লাগিল এইজন্য তিনি আপন গোলাম শব্দ বলিয়াছেন। আবু জাহল সম্পর্কে গোলাম শব্দ শুনিয়া আসমার খুব গোস্বা হইল। সে বলিতে লাগিল যে, তোমার কাছে আতর বিক্রয় করা আমার জন্য হারাম। রুবাইয়্যি (রাযিঃ) বলিলেন, আমার জন্যও তোর নিকট হইতে আতর ক্রয় করা হারাম। আমি তোর আতর ব্যতীত আর কাহারও আতরে নাপাকী ও দুর্গন্ধ দেখি নাই।(উঃ গাবা)

ফায়দা ঃ রুবাইয়্যি (রাযিঃ) বলেন, 'দুর্গন্ধ' শব্দটি আমি তাহাকে উত্তেজিত করিবার জন্য বলিয়াছিলাম। ইহা ছিল দ্বীনি মর্যাদাবোধ যে, দ্বীনের এতবড় শত্রু সম্পর্কে সরদার শব্দ ব্যবহার করা তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। আজকাল দ্বীনের বড় বড় দুশমনদের ক্ষেত্রেও ইহার চেয়ে সম্মানজনক শব্দ ব্যবহার করা হয়। আর কেহ যদি নিষেধ করে তবে

তাহাকে সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন বলা হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা মুনাফেককে সরদার বলিও না। যদি সে তোমাদের সরদার হইয়া থাকে তবে তোমরা আপন রবকে অসন্তুষ্ট করিয়াছ। (আবূ দাউদ)

জ্ঞাতব্য বিষয়

হুযূর (সঃ)এর বিবিগণ ও সন্তানগণ

আপন মনিব ও দুজাহানের সরদার হুযূর আকরাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণ ও সন্তানদের অবস্থা জানার আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার আর প্রত্যেক মুসলমানের হওয়াও চাই। তাই তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত অবস্থা লেখা হইতেছে। কেননা, বিস্তারিত অবস্থা আলোচনার জন্য বিরাট কিতাবের প্রয়োজন। মুহাদ্দিসীন এবং ঐতিহাসিকগণ এই ব্যাপারে একমত যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ এগার জন মহিলার সহিত হইয়াছে। ইহার বেশী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। আর এই ব্যাপারেও সকলেই একমত যে, সর্বপ্রথম বিবাহ হযরত খাদীজা (রাযিঃ)এর সহিত হইয়াছে যিনি বিধবা ছিলেন। ঐ সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল পঁচিশ বৎসর আর হযরত খাদীজা (রাযিঃ)এর বয়স ছিল চল্লিশ বৎসর। হযরত ইবরাহীম (রাযিঃ) ছাড়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত সন্তান হযরত খাদীজা (রাযিঃ) হইতে হইয়াছে। যাহাদের বিবরণ পরে আসিবে।

(১) হযরত খাদীজা (রাযিঃ)

হযরত খাদীজা (রাযিঃ)-এর বিবাহের সর্বপ্রথম প্রস্তাব ওরাকা বিন নাউফালের সহিত করা হইয়াছিল। কিন্তু বিবাহ হইয়া উঠে নাই। ইহার পর দুই ব্যক্তির সহিত বিবাহ হয়। তবে উক্ত দুইজনের মধ্যে প্রথমে কাহার সহিত হইয়াছিল সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশের মতে সর্বপ্রথম আতীক বিন আয়েযের সহিত বিবাহ হয়। যাহার ঘরে একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাহার নাম ছিল হিন্দ। তিনি বড় হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সন্তানের জননীও হন। আবার কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে, আতীকের ঔরসে একটি ছেলেও জন্মগ্রহণ করে। তাহার নাম ছিল আবদুল্লাহ বা আবদে মানাফ।

আতীকের পর পুনরায় হযরত খাদীজা (রাযিঃ)-এর বিবাহ আবু হালার সহিত হয়। তাহার ঔরসে হিন্দ ও হালা নামে দুই সন্তান জন্মগ্রহণ

করে। অধিকাংশের মতে উভয়ই পুত্র সন্তান ছিল। আবার কাহারও মতে হিন্দ পুত্র ছিল হালা কন্যা ছিলেন। হিন্দ হযরত আলী (রাযিঃ)এর খেলাফত কাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। আবু হালার ইন্তিকালের পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বিবাহ হয়। ঐ সময় হযরত খাদীজা (রাযিঃ)এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। পঁচিশ বছর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহাধীন থাকিয়া নবুয়তের ১০ম বৎসর পঁয়ষট্টি বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি অন্য কোন বিবাহ করেন নাই। ইসলামের পূর্ব হইতেই তাঁহার উপাধি ছিল তাহেরা (পবিত্র)। এইজন্য অন্যান্য স্বামীর ঔরসে তাঁহার যেসব সন্তান জন্মলাভ করে তাহাদিগকে 'বনু তাহেরা' বলা হয়।

হাদীসের কিতাবসমূহে তাহার বহু ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার ইন্তিকালের পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাঁহার কবরে অবতরণ করিয়া তাহাকে দাফন করিয়াছিলেন। তখনও জানাযার নামাযের প্রথা শরীয়তে চালু হইয়াছিল না।

তাহার ইন্তিকালের পর ঐ বৎসরই শাওয়াল মাসে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) এবং হযরত সাওদা (রাযিঃ)কে বিবাহ করেন। উহাদের মধ্যে কাহার বিবাহ প্রথমে হইয়াছে এই ব্যাপারেও মতভেদ রহিয়াছে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে হযরত আয়েশা (রাযিঃ)–এর বিবাহ প্রথমে আর কাহারও মতে হযরত সাওদা (রাযিঃ)–এর সহিত প্রথমে হইয়াছে এবং হযরত আয়েশা (রাযিঃ)–এর সহিত পরে হইয়াছে।

(২) হযরত সাওদা(রাযিঃ)

হযরত সাওদা (রাযিঃ)ও বিধবা ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম যামআ ইবনে কাইস। প্রথমে হযরত সাওদা (রাযিঃ)এর বিবাহ হইয়াছিল চাচাত ভাই সাকরান ইবনে আমরের সহিত। উভয় মুসলমান হন এবং হিজরত করিয়া হাবশায় চলিয়া যান। অতঃপর হাবশায় সাকরানের ইন্তিকাল হইয়া যায়। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে মক্কায় ফিরিয়া আসিবার পর ইন্তিকাল হয়। তাহার ইন্তিকালের পর নবুয়তের দশম বৎসর হযরত খাদীজা (রাযিঃ)এর মৃত্যুর কিছুদিন পর তাঁহার সহিত বিবাহ হয়। আর সকলের মতে তাঁহার রোখসতি হযরত আয়েশা (রাযিঃ)–এর রোখসতির পূর্বেই হইয়াছে।

অধিক পরিমাণে নামাযে মশগুল থাকা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিলই। একবার তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন যে, রাত্রে আপনি এত দীর্ঘ রুকু করিয়াছেন যে, আমার নাক হইতে রক্ত বাহির হওয়ার আশংকা হইয়া গেল। (তিনিও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত নামায পড়িতেছিলেন। যেহেতু ভারী শরীরের ছিলেন সেহেতু সম্ভবত বেশী কষ্ট হইয়াছিল।)

একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করিলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্বামীর খাহেশ নাই। কিন্তু বেহেশতে আপনার বিবিদের অন্তর্ভুক্ত থাকিবার আকাংখা রাখি, তাই আপনি আমাকে তালাক দিবেন না। আমি আমার পালা আয়েশা (রাযিঃ)কে দিয়া দিতেছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা কবুল করিয়া নিলেন। আর এই কারণে তাঁহার পালার দিন হযরত আয়েশা (রাযিঃ)–এর ভাগে আসিয়া যায়।

৫৪ অথবা ৫৫ হিজরীতে এবং কাহারও মতে হযরত ওমর (রাযিঃ)এর খেলাফত আমলের শেষ ভাগে ইন্তিকাল করেন।

তিনি ছাড়াও সওদা নামে কোরাইশ বংশীয় আরও একজন মহিলা ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি আরয করিলেন যে, আপনি সমগ্র দুনিয়াতে আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। তবে আমার পাঁচ–ছয়জন সন্তান রহিয়াছে। আমি ইহা পছন্দ করি না যে, তাহারা আপনার শিয়রের নিকট বসিয়া কান্নাকাটি করিবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার এই কথা পছন্দ করিলেন ও তাহার প্রশংসা করিলেন এবং বিবাহের ইচ্ছা মুলতবী করিয়া দিলেন।

(৩) হযরত আয়েশা (রাযিঃ)

হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর সহিতও হিজরতের পূর্বে নুবুওয়তের দশম বৎসর শাওয়াল মাসে মক্কা মোকাররামায় বিবাহ হয়। তখন তাঁহার বয়স ছিল ছয় বৎসর। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণের মধ্যে শুধু তিনিই এমন ছিলেন যাহার সহিত কুমারী অবস্থায় বিবাহ হয়। আর অন্যান্য সবার সহিত বিধবা অবস্থায় বিবাহ হয়। নবুওয়তের চার বছর পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হিজরতের পর যখন তাহার বয়স নয় বৎসর ছিল তখন তাহার রোখসতী হয় এবং ১৮ বছর বয়সের সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয় আর ৬৬ বছর বয়সে ৫৭ হিজরীতে ১৭ই রমযান মঙ্গলবার রাত্রে তাঁহার ইন্তিকাল হয়। তিনি নিজেই অসিয়ত

করিয়া গিয়াছিলেন যে, আমাকে যেন সাধারণ কবরস্থানে দাফন করা হয় যেখানে অন্যান্য বিবিদেরকে দাফন করা হইয়াছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হুজরা শরীফে দাফন করিবে না। সুতরাং তাঁহাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

আরবে প্রচলিত ছিল যে, শাওয়াল মাসে বিবাহ অশুভ হয়। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, আমার বিবাহও হইয়াছে শাওয়াল মাসে এবং আমার রোখসতীও হইয়াছে শাওয়াল মাসে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিদের মধ্যে আমার চাইতে ভাগ্যবতী এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমার চাইতে অধিক প্রিয় কে ছিল?

হযরত খাদীজা (রাযিঃ)–এর ইন্তিকালের পর খাওলা বিনতে হাকীম (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি বিবাহ করিবেন না? তিনি বলিলেন, কাহাকে? খাওলা বলিল, কুমারীও আছে বিধবাও আছে যাহাকে আপনি পছন্দ করেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, কুমারী হইল আপনার সবচাইতে অন্তরঙ্গ বন্ধু আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর কন্যা আয়েশা (রাযিঃ) আর বিধবা হইল সাওদা বিনতে যামআ (রাযিঃ)। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঠিক আছে আলোচনা করিয়া দেখ। তিনি সেইখান হইতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর ঘরে আসিলেন এবং হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর মাতা উম্মে রোমানকে বলিলেন যে, আমি একটি বড় কল্যাণ ও বরকতপূর্ণ বিষয় লইয়া আসিয়াছি। জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আয়েশা (রাযিঃ)এর সহিত বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য পাঠাইয়াছেন। উম্মে রোমান (রাযিঃ) বলিলেন, সে তো তাঁহার ভাতিজী তাহার সহিত কিভাবে বিবাহ হইতে পারে? ঠিক আছে আবু বকর (রাযিঃ)কে আসিতে দাও। ঐ সময় হযরত আবু বকর (রাযিঃ) ঘরে ছিলেন না। তিনি ঘরে আসিলে তাঁহার সহিতও এই বিষয় আলোচনা করিলেন। তিনিও একই কথা বলিলেন, সে তো তাহার ভাতিজী তাহার সহিত কিভাবে বিবাহ হইতে পারে? খাওলা (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে যাইয়া এইকথা শুনাইলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে আমার ইসলামী ভাই। তাহার কন্যার সহিত আমার বিবাহ জায়েয আছে। খাওলা (রাযিঃ) ফিরিয়া আসিলেন এবং হযরত আবু বকর

(রাযিঃ)কে এইকথা শুনাইলেন। সেখানে আর দেরীর কি ছিল? তৎক্ষণাৎ বলিলেন, যাও তাঁহাকে লইয়া আস। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ লইয়া গেলেন এবং বিবাহ হইয়া গেল। হিজরতের কয়েক মাস পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বলিলেন, আপনি আপনার স্ত্রী আয়েশাকে কেন উঠাইয়া নিতেছেন না? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না থাকার কথা জানাইলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) কিছু হাদিয়া পেশ করিলেন যাহা দ্বারা ব্যবস্থা হইয়া গেল। ১ম বা ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসে চাশতের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)–এর ঘরেই রোখসতী হইল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই তিনটি বিবাহ হিজরতের পূর্বে হইয়াছে, বাকী সব বিবাহ হিজরতের পরে হইয়াছে।

(৪) হযরত হাফসা(রাযিঃ)

হযরত আয়েশা (রাযিঃ)–এর পর হযরত ওমর (রাযিঃ)–এর কন্যা হযরত হাফসা (রাযিঃ)এর সহিত বিবাহ হয়। হযরত হাফসা (রাযিঃ) নবুওতের পাঁচ বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রথম বিবাহ মক্কাতেই খুনাইস ইবনে হুযায়ফা (রাযিঃ)এর সহিত হয়। তিনিও প্রবীণ মুসলমান। প্রথমে আবিসিনিয়া অতঃপর মদীনায় হিজরত করিয়াছেন। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। ঐ যুদ্ধেই অথবা উহুদের যুদ্ধে এমনভাবে আহত হইলেন যে, উহা হইতে আর আরোগ্য লাভ করিলেন না এবং ২য় বা ৩য় হিজরীতে ইন্তিকাল করিলেন। হযরত হাফসা (রাযিঃ)ও তাহার স্বামীর সহিত হিজরত করিয়া মদীনা তাইয়্যেবাতেই আসিয়া গিয়াছিলেন। যখন বিধবা হইয়া গেলেন তখন হযরত ওমর (রাযিঃ) প্রথম হযরত আবুবকর (রাযিঃ)–এর নিকট দরখাস্ত করিলেন যে, আমি হাফসা (রাযিঃ)এর বিবাহ আপনার সহিত করিতে চাহিতেছি। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) কিছু না বলিয়া নিরব থাকিলেন। অতঃপর হযরত উছমান (রাযিঃ)–এর বিবি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে হযরত রোকাইয়া (রাযিঃ)এর যখন ইন্তেকাল হইল তখন হযরত ওসমান (রাযিঃ)এর সহিত আলোচনা করিলেন। তিনি বলিয়া দিলেন যে, এই মুহূর্তে আমার বিবাহের ইচ্ছা নাই। হযরত ওমর (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই বিষয়ে অভিযোগ করিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি হাফসার জন্য

উছমানের চাইতে উত্তম স্বামী এবং উছমানের জন্য হাফসার চাইতে উত্তম স্ত্রীর ব্যবস্থা করিতেছি। অতঃপর ২য় বা ৩য় হিজরীতে হযরত হাফসাকে স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ করিলেন এবং হযরত উছমান (রাযিঃ)–এর বিবাহ আপন কন্যা উম্মে কুলছুমের সহিত করিয়া দিলেন। হযরত হাফসা (রাযিঃ)এর প্রথম স্বামী কখন ইন্তিকাল করিয়াছেন সেই ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণের পরস্পর মতভেদ রহিয়াছে যে, বদরের যুদ্ধে আহত হওয়ার কারণে শহীদ হইয়াছেন, না উহুদের যুদ্ধে শহীদ হইয়াছেন। বদরের যুদ্ধ হইয়াছে ২য় হিজরীতে আর উহুদের যুদ্ধ হইয়াছে ৩য় হিজরীতে। এই কারণে তাহার বিবাহের ব্যাপারেও মতপার্থক্য রহিয়াছে। অতঃপর হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযিঃ) হযরত ওমর (রাযিঃ)কে বলিলেন, যখন তুমি হাফসা (রাযিঃ)এর বিবাহের আলোচনা করিয়াছিলে তখন আমি নিরব থাকিয়াছিলাম। ইহাতে তুমি হয়ত অসন্তুষ্ট হইয়া থাকিবে কিন্তু যেহেতু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বিবাহের বিষয় আমার নিকট আলোচনা করিয়াছিলেন এইজন্য আমি না কবুল করিতে পারিতেছিলাম আর না হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন বিষয় প্রকাশ করিতে পারিতেছিলাম। এইজন্য আমি নিরবতা অবলম্বন করিয়াছিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি বিবাহের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতেন তবে আমি অবশ্যই বিবাহ করিতাম। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলেন, আবু বকর (রাযিঃ)এর নীরবতা আমার নিকট উছমান (রাযিঃ)এর অস্বীকৃতি হইতেও দুঃখজনক ছিল।

হযরত হাফসা (রাযিঃ) অত্যন্ত এবাদত গুজার ছিলেন। অধিক পরিমাণে রাত্রি জাগরণ করিতেন, দিনের বেশীর ভাগ রোযা রাখিতেন। কোন কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে এক তালাকও দিয়াছিলেন। ইহাতে হযরত উমর (রাযিঃ)এর অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছিল। আর এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। হযরত জিবরাইল (আঃ) আসিয়া আরজ করিলেন যে, আল্লাহ তায়ালার এরশাদ এই যে, আপনি হাফসাকে পুনরায় গ্রহণ করিয়া নিন। কারণে সে বড় রাত্রি জাগরণকারী ও অধিক পরিমাণে রোযা রাখিয়া থাকে। অপরদিকে হযরত ওমর (রাযিঃ)–এর খাতির করাও উদ্দেশ্য ছিল, তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় গ্রহণ করিয়া নিলেন।

৪৫ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে প্রায় ৬৩ বৎসর বয়সে তিনি মদীনা তাইয়্যেবায় ইন্তিকাল করেন। কেহ কেহ ৪১ হিজরীতে ৬০ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন বলিয়া লিখিয়াছেন।

(৫) হযরত যয়নাব (রাযিঃ)

হযরত হাফসা (রাযিঃ)–এর পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ হযরত যয়নাব (রাযিঃ)এর সহিত হয়। তাঁহার পিতার নাম খুযাইমা। হযরত যয়নাব (রাযিঃ)–এর প্রথম বিবাহ সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ লিখিয়াছেন প্রথমে আবদুল্লাহ ইবনে জাহ্শের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। তিনি যখন উহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। যাহা ৭ম অধ্যায়ের ১ম ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে। তখন হুযূর (সাঃ) তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। কেহ লিখিয়াছেন, তাঁহার প্রথম বিবাহ হইয়াছিল তোফাইল ইবনে হারেছের সহিত। সে তালাক দিয়া দিলে তাঁহার ভাই উবাইদা ইবনে হারেছ (রাযিঃ)এর সহিত বিবাহ হয়। যিনি বদরের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে সহিত হিজরতের একত্রিশ মাস পর ৩য় হিজরীর রমযান মাসে বিবাহ হয়। আটমাস নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহাধীনে থাকিয়া ৪র্থ হিজরীর রবিউস সানী মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণের মধ্যে হযরত খাদীজা (রাযিঃ) ও হযরত যয়নব (রাযিঃ) এই দুইজনই শুধু এমন ছিলেন, যাহাদের ইন্তেকাল হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় হইয়াছে। বাকী ৯ জন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের সময় জীবিত ছিলেন, যাহারা পরে ইন্তেকাল করেন। হযরত যয়নব (রাযিঃ) অত্যন্ত দানশীলা ছিলেন। এইজন্য ইসলামের পূর্বেও তাহার নাম উম্মুল মাসাকীন (গরীবের মা) ছিল।

(৬) হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ)

হযরত যয়নাব (রাযিঃ)–এর পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ)এর সহিত হয়। হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) আবু উমাইয়ার কন্যা ছিলেন। তাঁহার প্রথম বিবাহ আপন চাচাত ভাই আবু সালামা (রাযিঃ)এর সহিত হইয়াছিল। তাঁহার নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আসাদ। স্বামী–স্ত্রী উভয়ই প্রথম যুগের মুসলমান ছিলেন। কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া প্রথমে উভয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। সেখানে যাওয়ার পর একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে যাহার নাম সালামা ছিল। আবিসিনিয়া হইতে ফিরিয়া আসার পর মদীনা তাইয়্যেবায় হিজরত করেন। ইহার বিস্তারিত বিষয় এই অধ্যায়ের ৫নং ঘটনায় আলোচিত হইয়াছে। মদীনায় পৌঁছার

পর একটি পুত্রসন্তান ওমর (রাযিঃ) ও দুইটি কন্যাসন্তান দুররা ও যয়নাব জন্মগ্রহণ করে। আবু সালামা (রাযিঃ) দশজনের পর মুসলমান হইয়াছিলেন। বদর এবং উহুদের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। উহুদের যুদ্ধে একটি আঘাত লাগিয়াছিল যাহার দরুন খুব যন্ত্রণা ভোগ করেন। অতঃপর ৪র্থ হিজরীর সফর মাসে একটি যুদ্ধে গমন করেন। ফিরার সময় উক্ত ক্ষত পুনরায় তাজা হইয়া উঠিল এবং ঐ অবস্থায় ৪র্থ হিজরীতে ৮ই জুমাদাস সানী মাসে ইন্তিকাল করেন। হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) ঐ সময় অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। যয়নাব তাঁহার গর্ভে ছিলেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হইলে উম্মে সালামা (রাযিঃ)–এর ইদ্দত পূর্ণ হইয়া যায়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) তাহাকে বিবাহ করার আগ্রহ করিলে তিনি অপারগতা প্রকাশ করিলেন। ইহার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি আরজ করিলেন, আমার সন্তান–সন্ততিও রহিয়াছে অপর দিকে আমার স্বভাবে আত্মগর্বও খুব বেশী। আর আমার কোন ওলী বা অভিভাবকও এখানে নাই। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সন্তানদের হেফাজতকারী আল্লাহ। আর এই আত্মগর্বও ইনশাআল্লাহ দূর হইয়া যাইবে। আর তোমার কোন অভিভাবক ইহা অপছন্দ করিবেন না। তখন তিনি আপন পুত্র সালামাকে বলিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমার বিবাহ সম্পন্ন করিয়া দাও। ৪র্থ হিজরীতে শাওয়াল মাসের শেষ ভাগে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কেহ ৩য় হিজরীতে, আর কেহ ২য় হিজরীতে লিখিয়াছেন। হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছিলাম, যে ব্যক্তি কোন মুসীবতে পড়িয়া এই দোয়া করে—

اَللّٰهُمَّ اْجُرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْنِىْ خَيْرًا مِّنْهَا "হে আল্লাহ! আমাকে এই মুসীবতে ছাওয়াব দান করুন এবং ইহার উত্তম বদলা আমাকে দান করুন।"

তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকো সর্বোত্তম বদলা দান করেন। আবু সালামা (রাযিঃ)এর ইন্তিকালের পর আমি এই দোয়া পড়িতাম। কিন্তু মনে মনে ভাবিতাম যে, আবু সালামার চাইতে উত্তম ব্যক্তি আর কে হইতে পারে। আল্লাহ তায়ালা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমার বিবাহ করাইয়া দিলেন।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, তাহার রূপের খুব খ্যাতি ছিল। বিবাহের পর আমি লুকাইয়া কোন এক বাহানায় যাইয়া তাঁহাকে

দেখিলাম। যেমন শুনিয়াছিলাম তাহার চাইতে বেশী পাইলাম। আমি হাফসার নিকট ইহা বলিলাম। তিনি বলিলেন, না, যত ছড়াইয়াছে তত রূপসী নয়। ৫৯ বা ৬২ হিজরীতে উম্মুল মো'মেনীনদের মধ্যে সর্বশেষে হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল ৮৪ বৎসর। এই হিসাবে তাঁহার জন্ম নবুওতের প্রায় নয় বছর পূর্বে হইয়াছে। হযরত যয়নাব বিনতে খুযাইমা (রাযিঃ)এর ইন্তিকালের পর তাহার সহিত বিবাহ হয় এবং হযরত যয়নাব (রাযিঃ)এর ঘরে অবস্থান করেন। তিনি সেখানে একটি পাত্রে কিছু যব, একটি জাঁতা এবং পাতিলও দেখিতে পান। তিনি স্বয়ং যব পিষিয়া চর্বি ঢালিয়া হালুয়া জাতীয় একপ্রকার খাবার তৈরী করিলেন এবং প্রথম দিনেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঐ খাবার খাওয়াইলেন যাহা বিবাহের দিন নিজ হাতে তিনি পাকাইয়াছিলেন।

(৭) হযরত যয়নাব বিনতে জাহ্শ (রাযিঃ)

হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ)এর পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ হযরত যয়নাব বিনতে জাহশ (রাযিঃ)এর সহিত হয়। তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফাত বোন ছিলেন। তাঁহার প্রথম বিবাহ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ পালকপুত্র হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রাযিঃ)এর সহিত করিয়াছিলেন। হযরত যায়েদ (রাযিঃ) তাঁহাকে তালাক দেওয়ার পর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত তাঁহার বিবাহ করাইয়া দেন। সূরায়ে আহযাবেও এই ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। তখন তাঁহার বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ বছর। প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী তাঁহার বিবাহ হয় ৫ম হিজরীর যিলকদ মাসে। কোন কোন বর্ণনায় ৩য় হিজরীর কথা উল্লেখ রহিয়াছে। তবে ৫ম হিজরীর বর্ণনাই সঠিক। এই হিসাবে তাঁহার জন্ম হইয়াছে নবুওতের ১৭ বছর পূর্বে। তাহার এই বিষয়ে গর্ব ছিল যে, সকল বিবিগণের বিবাহের ব্যবস্থা তাহাদের অভিভাবকরা করিয়াছেন আর তাহার বিবাহের ব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা করিয়াছেন।

হযরত যায়েদ (রাযিঃ) যখন তাঁহাকে তালাক দিলেন এবং ইদ্দত অতিবাহিত হইল তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার কাছে বিবাহের পয়গাম পাঠালেন। তিনি উত্তরে বলিলেন, আমি আল্লাহ তায়ালার সহিত পরামর্শ না করা পর্যন্ত কিছুই বলিতে পারিব না। এই বলিয়া তিনি অযু করিয়া নামাযের নিয়ত করিলেন এবং এই দোয়া

করিলেন যে, "হে আল্লাহ! আপনার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিবাহ করিতে চাহেন। আমি যদি তাঁহার উপযুক্ত হই তবে আমার বিবাহ তাঁহার সহিত করাইয়া দিন।"

এদিকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কুরআনে শরীফের আয়াত নাযিল হইল—فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا

তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুসংবাদ পাঠাইলেন, হযরত যয়নাব খুশীতে সেজদায় পড়িয়া গেলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত জাঁক–জমকের সহিত তাঁহার বিবাহের ওলীমা করিলেন। ছাগল জবাই করিয়া রুটি–গোশতের দাওয়াত করিলেন। এক একদলকে ডাকা হইত এবং তাহাদের খাওয়া শেষ হইলে আরেক দলকে ডাকা হইত। এইভাবে সবাই পেট ভরিয়া খানা খাইলেন।

হযরত যয়নাব (রাযিঃ) অত্যন্ত দানশীলা ও পরিশ্রমী ছিলেন। নিজ হাতে কাজ করিয়া যাহা উপার্জন করিতেন তাহা সদকা করিয়া দিতেন। তাঁহার ব্যাপারেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছিলেন, আমার ইন্তিকালের পর সর্বপ্রথম আমার সহিত সেই মিলিত হইবে যাহার হাত লম্বা হইবে। এই কথা শুনিয়া বিবিগণ সবাই বাহ্যিক লম্বা হওয়া মনে করিয়া কাঠ লইয়া সকলের হাত মাপিতে শুরু করিলেন। দেখিতে হযরত সাওদা (রাযিঃ)এর হাত সবচেয়ে লম্বা প্রমাণিত হইল। কিন্তু যখন হযরত যয়নাব (রাযিঃ)এর ইন্তিকাল সর্বপ্রথম হইল তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, হাত লম্বা হওয়া বলিতে অধিক সদকা ও দান করাকে বুঝানো হইয়াছে। তিনি অনেক বেশী রোযাও রাখিতেন। ২০ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) তাঁহার জানাযার নামায পড়াইয়াছেন। ইন্তিকালের সময় তাঁহার বয়স ছিল ৫০ বৎসর। তাহার সম্পর্কে এই অধ্যায়ের ১০নং ঘটনাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

(৮) হযরত জুওয়াইরিয়া বিনতে হারেস (রাযিঃ)

হযরত যয়নব বিনতে জাহ্‌শ (রাযিঃ)এর পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ হযরত জুওয়াইরিয়া বিনতে হারেছ ইবনে আবি যেরার (রাযিঃ)এর সহিত হয়। তিনি মুরাইসীর যুদ্ধে বন্দী হইয়া আসিয়াছিলেন এবং গনীমতের অংশ হিসাবে হযরত কাইস ইবনে ছাবেত (রাযিঃ)–এর ভাগে পড়িয়াছিলেন। বন্দী হওয়ার পূর্বে মুসাফে ইবনে সাফওয়ানের বিবাহাধীন ছিলেন। হযরত ছাবেত (রাযিঃ) নয় উকিয়া স্বর্ণের বিনিময়ে তাঁহাকে মুকাতাব করিয়া দেন। মুকাতাব ঐ গোলাম

অথবা বাঁদীকে বলা হয় যাহার সহিত এই চুক্তি করা হয় যে, তুমি যদি আমাকে এত মূল্য দিতে পার তবে তুমি আযাদ বা মুক্ত হইয়া যাইবে। এক উকিয়া চল্লিশ দেরহামের সমান। এক দেরহাম হইল, প্রায় সাড়ে তিন আনা। এই হিসাবে নয় উকিয়া ৭৮ ভরি ১২ আনার সমান হয়। আর যদি এক দেরহাম চার আনা সমান হয় তবে নয় উকিয়া ৯০ ভরির সমান হয়।

হযরত জুওয়াইরিয়া (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপন গোত্রের সর্দার হারেছের কন্যা জুওয়াইরিয়া। আমার উপর যে মুসীবত আসিয়াছে তাহা আপনি জানেন। এই পরিমাণ অর্থ আদায়ের শর্তে আমি মুকাতাব হইয়াছি। উহা পরিশোধ করা আমার ক্ষমতার বাহিরে। তাই আপনার খেদমতে সাহায্যের আশা লইয়া আসিয়াছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাকে ইহার চাইতেও উত্তম পন্থা বলিতেছি। আমি অর্থ পরিশোধ করিয়া তোমাকে আযাদ (মুক্ত) করিয়া দিব এবং তোমাকে বিবাহ করিয়া লইব। তাহার জন্য ইহার চাইতে উত্তম পন্থা আর কি ছিল। তিনি আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া লইলেন। প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী ৫ম হিজরীতে আর কাহারও মতে ৬ষ্ঠ হিজরীতে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) যখন জানিতে পারিলেন যে, বনু মুসতালেক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্বশুরালয় হইয়া গিয়াছে, তখন তাঁহারা এই আত্মীয়তার সম্মানার্থে নিজ নিজ গোলামদেরকে মুক্ত করিয়া দিলেন। বলা হয় যে, শুধু হযরত জুওয়াইরিয়া (রাযিঃ)এর কারণে একশ' পরিবার মুক্ত হইয়া যায়, যাহাতে প্রায় সাতশ' লোক ছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য বিবাহের মধ্যেও এই ধরনের কল্যাণ নিহিত ছিল।

হযরত জুওয়াইরিয়া (রাযিঃ) অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। চেহারায় লাবণ্যতা ছিল। বর্ণিত আছে, তাঁহার প্রতি কাহারও দৃষ্টি পড়িলে আর উঠিত না। হযরত জুওয়াইরিয়া (রাযিঃ) এই যুদ্ধের তিন দিন আগে একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, ইয়াছরিব অর্থাৎ মদীনা হইতে একটি চাঁদ চলিতে চলিতে আমার কোলের মধ্যে আসিয়া গেল। তিনি বলেন, আমি যখন বন্দী হই তখন আমি আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বাস্তবায়িত হওয়ার আশা করিতেছিলাম। ঐ সময় তাঁহার বয়স ছিল ২০ বছর। বিশুদ্ধ বর্ণনানুযায়ী তিনি ৫০ হিজরীতে রবিউল আউয়াল মাসে ৬৫ বছর বয়সে মদীনা তাইয়্যেবাতে ইন্তিকাল করেন। কাহারো মতে ৫৬ হিজরীতে ৭০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

(৯) হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ)

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) ছিলেন আবু সুফিয়ানের মেয়ে। তাঁহার নামের ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশের মতে রামলাহ আর কাহারও মতে হিন্দ। তাহার প্রথম বিবাহ উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহশের সহিত মক্কা মুকাররমাতে হইয়াছিল। স্বামী–স্ত্রী উভয়ই মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন। কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া মাতৃভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। উভয়ই আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। সেখানে গিয়া স্বামী খৃষ্টান হইয়া যায়। কিন্তু হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) ইসলামের উপর অটল থাকেন। তিনি ঐ রাত্রেই স্বপ্নযোগে স্বামীকে অত্যন্ত কুৎসিত অবস্থায় দেখিতে পান। ভোরে জানিতে পারিলেন যে, সে খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে। ঐরূপ একাকী অবস্থায় তাহার উপর কি অতিবাহিত হইয়া থাকিবে তাহা আল্লাহ পাকই জানেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহে আনিয়া তাঁহাকে উহার উত্তম বদলা দান করিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবিসিনিয়ার বাদশা নাজাশীর নিকট এই বার্তা পাঠাইলেন যে, তাহার বিবাহ আমার সহিত করিয়া দাও। বাদশাহ আবরাহা নাম্নী এক মহিলাকে উক্ত পয়গাম দিয়া তাহার খবর লওয়ার জন্য পাঠাইলেন। ইহা শুনামাত্র তিনি আনন্দে উভয় হাতে যে চুড়ি পরিহিত ছিলেন উহা তাহাকে দিয়া দিলেন এবং পায়ের খাড়ু ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিস দিয়া দিলেন। নাজাশী বিবাহ সম্পাদন করিয়া দিলেন এবং নিজের পক্ষ হইতে চারশত দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) মহর স্বরূপ আদায় করিলেন। আরো বহু জিনিস দিলেন। যাহারা বিবাহের মজলিশে উপস্থিত ছিলেন তাহাদিগকেও স্বর্ণমুদ্রা দান করিলেন ও খানা খাওয়াইলেন। অধিকাংশের মতে তাঁহার বিবাহ ৭ম হিজরীতে হইয়াছে আর কাহারও কাহারও মতে ৬ষ্ঠ হিজরীতে হইয়াছে। তারিখে খামীস নামক কিতাবের লেখক লিখিয়াছেন, তাহার বিবাহ ৬ষ্ঠ হিজরীতে হইয়াছে এবং ৭ম হিজরীতে মদীনায় পৌঁছার পর রোখসতী হইয়াছে।

নাজাশী বিবাহের পর বহু খুশবো দ্রব্য এবং অন্যান্য আসবাবপত্র ও যৌতুক ইত্যাদি দিয়া তাঁহাকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পাঠাইয়া দেন। কোন কোন ইতিহাসগ্রন্থ এবং হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, উম্মে হাবীবা (রাযিঃ)এর এই বিবাহ তাঁহার পিতা সম্পাদন করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ঠিক নয়। কেননা তাঁহার পিতা তখনও মুসলমান হইয়াছিলেন না। তিনি এই ঘটনার পর মুসলমান হইয়াছেন। হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ)এর একটি ঘটনা এই অধ্যায়ের ৯ নম্বরে বর্ণিত

হইয়াছে। তাঁহার ইন্তেকাল সম্পর্কে বহু মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশের মতে ৪৪ হিজরীতে হইয়াছে। ইহা ছাড়াও ৪২ হিজরী, ৫৫ হিজরী, ৫০ হিজরী ইত্যাদির কথাও উল্লেখ আছে।

(১০) হযরত সফিয়্যা (রাযিঃ)

উম্মুল মুমিনীন হযরত সফিয়্যা (রাযিঃ) হুয়াইয়ের কন্যা এবং হযরত মূসা (আঃ)এর ভাই হারূন (আঃ)এর বংশধর ছিলেন। প্রথমে সাল্লাম ইবনে মিশকামের বিবাহাধীন ছিলেন তারপর কেনানা ইবনে আবি হুকাইকের সঙ্গে বিবাহ হয়। এই দ্বিতীয় বিবাহ যখন হয় তখন খাইবারের যুদ্ধ শুরু হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার স্বামী ঐ যুদ্ধে নিহত হয়। খাইবারের যুদ্ধের পর দিহ্ইয়া কালবী (রাযিঃ) নামক সাহাবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি বাঁদী চাহিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফিয়্যাকে দিয়া দিলেন। কিন্তু মদীনায় বনু কুরাইযা ও বনু নাযীর নামে দুইটি গোত্র বাস করিত এবং হযরত সফিয়্যা (রাযিঃ) ইহুদী সরদারের কন্যা ছিলেন। এইজন্য লোকেরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিল যে, ইহা অনেক মানুষের নিকটই অপছন্দনীয় হইবে। সফিয়্যা (রাযিঃ)কে যদি স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন বিবাহে গ্রহণ করিয়া লন তবে ইহা অনেকের সন্তুষ্টির কারণ হইবে। এইজন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিহইয়া কালবী (রাযিঃ)কে উপযুক্ত বিনিময় প্রদান করিয়া তাঁহাকে লইয়া লইলেন। এবং তাঁহাকে মুক্ত করিয়া বিবাহ করিয়া লইলেন। খাইবার হইতে ফিরিবার পথে এক মঞ্জিলে তাহার রোখসতী হয়। সকাল বেলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যাহার কাছে যাহা কিছু খাদ্যদ্রব্য আছে উহা লইয়া আস। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের নিকট বিভিন্ন জিনিস খেজুর, পনির, ঘি ইত্যাদি যাহা ছিল লইয়া আসিলেন। একটি চামড়ার দস্তরখান বিছাইয়া উহার উপর ঐসব খাবার রাখা হইল এবং সকলে একত্রে খাইলেন। ইহাই ছিল ওলিমা। কোন কোন বর্ণনামতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে স্বাধীনতা দিয়াছিলেন যে, তুমি যদি আপন কওমের সঙ্গে এবং নিজ দেশে থাকিতে চাও তবে তুমি মুক্ত, চলিয়া যাইতে পার। আর যদি আমার নিকট আমার বিবাহাধীনে থাকিতে চাও তবে থাকিতে পার। তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি শিরক অবস্থায় আপনার আকাংখা করিতাম এখন মুসলমান হইয়া কিরূপে চলিয়া যাইতে পারি। এই কথা দ্বারা হয়ত তিনি

ঐ স্বপ্নকে বুঝাইয়াছেন, যাহা একবার তিনি মুসলমান হওয়ার পূর্বে দেখিয়াছিলেন যে, এক খণ্ড চাঁদ তাঁহার কোলে পড়িয়া রহিয়াছে। স্বামী কেনানার নিকট এই স্বপ্ন বর্ণনা করিলে সে তাঁহার মুখের উপর এত জোরে একটি চড় মারিল যে, চোখের উপর উহার দাগ পড়িয়া গেল। অতঃপর বলিল, তুই ইয়াছরিবের বাদশার সহিত বিবাহ বসার আকাঙ্খা করিতেছিস?

একবার স্বপ্ন দেখিলেন যে, সূর্য তাঁহার বুকের উপর। ইহাও স্বামীর নিকট বর্ণনা করেন। স্বামী অনুরূপ কথাই বলিল যে, তুই ইয়াছরিবের বাদশাহর বিবাহে যাইতে চাহিতেছিস? একবার তিনি চাঁদকে কোলের মধ্যে দেখিয়া পিতার কাছে বলিলে সেও একটি চড় মারিয়া বলিল যে, তোর দৃষ্টি ইয়াছরিবের বাদশাহর প্রতি যাইতেছে। হইতে পারে চাঁদ সম্পর্কিত একই স্বপ্ন পিতা ও স্বামী উভয়ের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন অথবা স্বপ্নে চাঁদ দুইবার দেখিয়াছেন।

বিশুদ্ধ বর্ণনানুযায়ী ৫০ হিজরীর রমযান মাসে ইন্তিকাল করেন। ইন্তিকালের সময় তাঁহার বয়স ছিল প্রায় ৬০ বছর। তিনি নিজে বর্ণনা করেন, আমি যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহে আসি তখন আমার বয়স সতর বছর পূর্ণ হইয়া ছিল না।

(১১) হযরত মাইমূনা (রাযিঃ)

উম্মুল মুমিনীন হযরত মাইমূনা (রাযিঃ) ছিলেন হারেছ ইবনে হাযনের মেয়ে। তাঁহার আসল নাম ছিল বাররা। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবর্তন করিয়া মাইমূনা রাখেন। প্রথমে আবু রুহম ইবনে আবদুল উয্যার বিবাহে ছিলেন। ইহাই অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের অভিমত। প্রথম স্বামীর নামের ব্যাপারে আরো অনেক উক্তি রহিয়াছে। কাহারও মতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বেও দুই বিবাহ হইয়াছিল। বিধবা হইয়া যাওয়ার পর ৭ম হিজরীতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররামা যাইতেছিলেন তখন পথিমধ্যে সারিফ নামক স্থানে বিবাহ হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাহিয়াছিলেন যে, ওমরাহ শেষ করিয়া মক্কাতে রোখছতী হইবে। কিন্তু মক্কাবাসীরা অবস্থান করিতে অনুমতি দিল না। এইজন্য ফিরার পথে সারিফ নামক জায়গাতেই রোখছতী হইল। আবার বিশুদ্ধ বর্ণনানুযায়ী সারিফ নামক স্থানের ঐ জায়গাতেই যেখানে রোখছতীর তাঁবু ছিল। ৫১ হিজরীতে তাহার ইন্তিকাল হয়, আর কেহ কেহ

৬১ হিজরী বলিয়া উল্লেখ করেন। ইন্তিকালের সময় তাঁহার বয়স ছিল ৮১ বছর। অতঃপর সেই জায়গাতেই তাহার কবর হয়। ইহা একটি শিক্ষণীয় ঘটনা এবং ইতিহাসের আশ্চর্য বিষয় যে, একই জায়গায় এক সফরে বিবাহ হয় অপর সফরে রোখছতী হয় আবার দীর্ঘদিন পর ঠিক ঐ জায়গাতেই সমাহিত হন।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, মায়মূনা (রাযিঃ) আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরহেযগার এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী ছিলেন। ইয়াযীদ ইবনে আসাম্ম (রাযিঃ) বলেন, তাঁহার কাজ ছিল সবসময় নামায পড়া অথবা ঘরের কাজকর্ম করা। যখন এই দুইকাজ হইতে অবসর হইতেন তখন মিসওয়াক করিতে থাকিতেন। যেসব মহিলাদের বিবাহের ব্যাপারে মুহাদ্দিছ ও ঐতিহাসিকগণ একমত, তাহাদের মধ্যে হযরত মাইমুনা (রাযিঃ)এর বিবাহ হইল সর্বশেষ বিবাহ। এইসবের মধ্যবর্তী ধারাবাহিকতা র মধ্যে অবশ্য মতভেদ রহিয়াছে। যাহা ঐ সকল বিবাহের তারিখ সম্পর্কে যেমন সংক্ষেপে জানা গেল।

এগারজন বিবিদের মধ্যে দুইজনের মৃত্যু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় হইয়াছিল। তন্মধ্যে একজন হইলেন হযরত খাদীজা (রাযিঃ) অপরজন হইলেন হযরত যয়নাব বিনতে খুযাইমা। অবশিষ্ট নয়জন বিবি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের সময় জীবিত ছিলেন।

উপরে বর্ণিত বিবাহ ছাড়া কতক মুহাদ্দিছ ও ঐতিহাসিক আরো কয়েকটি বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন, যেগুলি হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। কেবল সর্বসম্মত বিবাহগুলিই আলাচনা করা হইয়াছে।

হুযূর (সঃ)এর সন্তান-সন্ততি

ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিছগণ এই ব্যাপারে একমত যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চার মেয়ে ছিল। তন্মধ্যে অধিকাংশের বিশুদ্ধ মত হইল সকলের বড় ছিলেন হযরত যয়নাব (রাযিঃ)। অতঃপর হযরত রোকাইয়্যা। তারপর হযরত উম্মে কুলছুম, তারপর হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)। পুত্রসন্তানদের ব্যাপারে অবশ্য মতভেদ রহিয়াছে। ইহার কারণ হইল তাঁহারা সকলে শৈশবকালেই ইন্তিকাল করিয়া গিয়াছেন। ইহাছাড়া আরবে তখন ইতিহাস লেখার প্রতি তেমন একটা গুরুত্ব দেওয়া হইত না। আর তখন জীবন উৎসর্গকারী সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যাও তত অধিক ছিল না, যাহাতে প্রত্যেক বিষয় পূর্ণরূপে সংরক্ষণ করিবেন। অধিকাংশের

মতে পুত্রসন্তানদের মধ্যে ছিলেন হযরত কাসেম (রাযিঃ), হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) ও হযরত ইবরাহীম (রাযিঃ) এই তিনজন। কতকের মতে চতুর্থ পুত্র ছিলেন হযরত তৈয়্যব (রাযিঃ) আর পঞ্চম পুত্র ছিলেন হযরত তাহের (রাযিঃ)। এই হিসাবে পাঁচজন হইলেন। কতকের মতে তৈয়্যব ও তাহের একজনেরই নাম। এই হিসাবে চারজন হইলেন। আর কাহারও মতে আবদুল্লাহর নামই তৈয়্যব এবং তাহের। এই হিসাবে তিন পুত্রই হইল। আর কেহ কেহ মুতাইয়্যাব ও মুতাহ্হার নামে আরো দুই পুত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তৈয়্যব ও মুতাইয়্যাব এক সঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন আর তাহের ও মুতাহ্হার একসঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই হিসাবে সাতপুত্র হইল। তবে অধিকাংশের মতে পুত্র সংখ্যা তিন। একমাত্র হযরত ইবরাহীম (রাযিঃ) ব্যতীত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত সন্তান হযরত খাদীজার গর্ভ হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

(১) হযরত কাসেম (রাযিঃ)

পুত্রগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত কাসেম (রাযিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তবে হযরত যয়নাব (রাযিঃ) তাঁহার চেয়ে বড় ছিলেন, না ছোট ছিলেন এই ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। হযরত কাসেম (রাযিঃ) শিশুকালেই ইন্তিকাল করিয়াছেন। অধিকাংশই তাঁহার বয়স দুই বৎসর লিখিয়াছেন। আবার কেহ কেহ উহার চেয়ে কম বা বেশীও লিখিয়াছেন।

(২) হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ)

দ্বিতীয় পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) নবুওতের পর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আর এই কারণে তাঁহার নাম তৈয়্যব এবং তাহেরও প্রসিদ্ধ হইয়া যায়। তিনি শৈশবেই ইন্তিকাল করেন। তাঁহার ইন্তিকালে আর কতকের মতে হযরত কাসেম (রাযিঃ)এর ইন্তিকালে কাফেররা ইহা মনে করিয়া অত্যন্ত খুশী হয় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধারা বন্ধ হইয়া গেল। যাহার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা আল–কাউছার নাযিল হয়। আর কাফেরদের এই কথার যে, যখন বংশধারা শেষ হইয়া গেল তখন কিছুদিনের মধ্যে তাঁহার নামও মিটিয়া যাইবে, এই জবাব মিলিল যে, আজ সাড়ে তের শত বছর পর পর্যন্তও তাঁহার নামের উপর জীবন উৎসর্গকারী কোটি কোটি মানুষ বিদ্যমান রহিয়াছে।

(৩) হযরত ইবরাহীম (রাযিঃ)

তৃতীয় পুত্র ছিলেন হযরত ইবরাহীম (রাযিঃ)। তিনি সর্বসম্মতিক্রমে

৮ম হিজরীর যিলহজ্জ মাসে মদীনায় তাইয়্যেবায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাঁদী মারিয়া (রাযিঃ)এর গর্ভে জন্মলাভ করেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ সন্তান। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৭ম দিনে তাঁহার আকীকা করেন এবং দুইটি ভেড়া জবাই করেন। চুলের সমপরিমাণ রূপা সদকা করিয়া দেন এবং চুলগুলি দাফন করাইয়া দেন। আবু হিন্দ বায়াযী (রাযিঃ) তাঁহার মাথার চুল মুড়াইয়াছিলেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি আমার পিতার নামে নাম রাখিয়াছি। তিনিও ১৬ মাস বয়সে ১০ম হিজরীর ১০ই রবিউল আউয়াল ইন্তিকাল করেন। কেহ কেহ ১৮ মাস বয়সের কথা বলিয়াছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ইবরাহীমের জন্য জান্নাতে দুধপানকারিণী নিযুক্ত হইয়া গিয়াছে।

(১) হযরত যয়নাব (রাযিঃ)

কন্যাদের মধ্যে সকলের বড় হইলেন হযরত যয়নাব (রাযিঃ)। যে সকল ঐতিহাসিক ইহার ব্যতিক্রম লিখিয়াছেন উহা ভুল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহের ৫ বৎসর পর যখন তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর ছিল তখন হযরত যয়নাব (রাযিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। পিতামাতার কোলে বড় হন এবং মুসলমান হন। অতঃপর আপন খালাত ভাই আবুল আস ইবনে রবীর সহিত বিবাহ হয়। বদরের যুদ্ধের পর হিজরত করেন। হিজরত কালে মুশরেকদের ঘৃণ্য আচরণে আহত হন, যাহা এই অধ্যায়ের ২০ নম্বর ঘটনায় বর্ণনা করা হইয়াছে। উক্ত আঘাতের কারণে সবসময় অসুস্থ থাকিতেন। শেষ পর্যন্ত ৮ম হিজরীর শুরুতে ইন্তিকাল করেন। তাঁহার স্বামীও ৬ষ্ঠ অথবা ৭ম হিজরীতে মুসলমান হইয়া মদীনায় পৌছিয়া গিয়াছিলেন এবং হযরত যয়নাব (রাযিঃ) তাহারই বিবাহ বন্ধনে রহিলেন। তাহার দুইজন সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে একজন পুত্র এবং একজন কন্যা। পুত্রের নাম ছিল আলী (রাযিঃ)। যিনি মাতার ইন্তিকালের পর প্রায় পরিণত বয়সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই ইন্তিকাল করেন। মক্কা বিজয়ের সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত উটনীর উপর যিনি সাওয়ার ছিলেন তিনি এই হযরত আলী (রাযিঃ)ই ছিলেন। আর মেয়ের নাম ছিল উমামা (রাযিঃ)। যাহার সম্পর্কে হাদীছের কিতাবসমূহে বহু ঘটনা আসিয়াছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে সেজদা করিতেন তখন তিনি তাঁহার

কোমরের উপর চড়িয়া বসিতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পরও তিনি বাঁচিয়া ছিলেন। তাহার খালা হযরত সাইয়্যেদা ফাতেমা (রাযিঃ)–এর ইন্তিকালের পর হযরত আলী (রাযিঃ) তাঁহাকে বিবাহ করেন। হযরত আলী (রাযিঃ)এর ইন্তিকালের পর তাঁহার বিবাহ মুগীরা ইবনে নাওফাল (রাযিঃ)এর সহিত হয়। তাহার গর্ভ হইতে হযরত আলী (রাযিঃ)এর কোন সন্তান হয় নাই। অবশ্য মুগীরা (রাযিঃ) হইতে ইয়াহইয়া নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন। আবার অনেকে ইহা অস্বীকার করিয়াছেন।

বর্ণিত আছে, হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) নিজেই এই অছিয়ত করিয়া গিয়াছিলেন যে, আমার মৃত্যুর পর যেন হযরত আলী (রাযিঃ)এর বিবাহ বোনের মেয়ের সহিত করানো হয়। ৫০ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

(২) হযরত রুকাইয়্যা (রাযিঃ)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ২য় কন্যা রোকাইয়্যা (রাযিঃ) ছিলেন। তিনি আপন বোন যয়নাব (রাযিঃ)এর তিন বছর পর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল তেত্রিশ বছর। কেহ কেহ হযরত রুকাইয়্যা (রাযিঃ)কে হযরত যয়নাব (রাযিঃ) হইতে বড় বলিয়াছেন। কিন্তু সঠিক ইহাই যে, তিনি হযরত যয়নাব (রাযিঃ) হইতে ছোট ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু লাহাবের পুত্র উতবার সহিত বিবাহ হইয়াছিল। যখন সূরা তাব্বাৎ নাযিল হইল তখন আবু লাহাব আপন পুত্র উতবা এবং তাহার ভাই উতাইবাকে যাহার সহিত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তৃতীয় কন্যা উম্মে কুলছুম (রাযিঃ)এর বিবাহ হইয়াছিল। বলিল যে, তোমাদের দুইজনের সহিত আমার দেখা করা হারাম হইবে যদি তোমরা মুহাম্মদের কন্যাদিগকে তালাক না দাও। ইহাতে তাহারা উভয়েই তালাক দিয়া দিল। এই দুইটি বিবাহ বাল্যকালে হইয়াছিল। রোখসুতীর সুযোগই হয় নাই। অতঃপর মক্কা বিজয়ের সময় হযরত রোকাইয়্যা (রাযিঃ)এর স্বামী উতবা মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পূর্বেই যেহেতু স্ত্রীকে তালাক দিয়া ফেলিয়াছিলেন সেহেতু হযরত উসমান (রাযিঃ)এর সহিত হযরত রোকাইয়্যা (রাযিঃ)এর অনেক দিন আগেই বিবাহ হইয়া গিয়াছিল।

হযরত উছমান (রাযিঃ) ও হযরত রোকাইয়্যা (রাযিঃ) দুইবারই আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়াছিলেন। যাহার বর্ণনা ১ম অধ্যায়ের ১০

নম্বর ঘটনায় গত হইয়াছে। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইরশাদ করিলেন যে, আমাকেও হিজরতের হুকুম দেওয়া হইবে এবং মদীনা মুনাওয়ারা আমার হিজরতের স্থান হইবে। তখন সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) মদীনা তাইয়্যেবায় হিজরত শুরু করিয়া দিলেন। ঐ সময় এই দুইজনও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বেই মদীনা তাইয়্যেবায় পৌছিয়া গিয়াছিলেন। হিজরতের পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বদরের যুদ্ধে যাইতেছিলেন তখন হযরত রোকাইয়্যা (রাযিঃ) অসুস্থ ছিলেন। এই কারণে তাঁহার পরিচর্যার জন্য হযরত উছমান (রাযিঃ)কে মদীনায় রাখিয়া যান। বদরের যুদ্ধের বিজয়ের সুসংবাদ মদীনা তাইয়্যেবাতে এমন সময় পৌছিল যখন তাহারা হযরত রোকাইয়া (রাযিঃ)কে দাফন করিয়া আসিতেছিলেন। এইজন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার দাফন কার্যে শরীক হইতে পারেন নাই।

হযরত রোকাইয়্যা (রাযিঃ)এর যেহেতু প্রথম স্বামীর সহিত রোখসুতীই হইতে পারে নাই কাজেই সন্তানের কোন প্রশ্নই আসে না। অবশ্য হযরত উছমান (রাযিঃ)এর ঔরসে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) নামে এক ছেলে আবিসিনিয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মাতার ইন্তিকালের পরেও তিনি জীবিত ছিলেন এবং ছয় বছর বয়সে চতুর্থ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কাহারো মতে মাতার ইন্তিকালের এক বছর পূর্বে ইন্তিকাল করেন। ইহাছাড়া হযরত রোকাইয়্যা (রাযিঃ)এর অন্য কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই।

(৩) হযরত উম্মে কুলসুম (রাযিঃ)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তৃতীয় কন্যা ছিলেন হযরত উম্মে কুলছুম (রাযিঃ)। হযরত উম্মে কুলছুম (রাযিঃ) ও হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)এর মধ্যে কে বড় ছিলেন এই বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশের মতে হযরত উম্মে কুলছুম (রাযিঃ) বড় ছিলেন। প্রথমে উতাইবা ইবনে আবু লাহাবের সহিত বিবাহ হয় কিন্তু রোখসতী হইয়াছিল না। যেহেতু সূরায়ে 'তাব্বাত ইয়াদা' নাযিল হওয়ার কারণে তালাক হইয়া যায়। যাহা হযরত রোকাইয়া (রাযিঃ)এর ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার স্বামী পরে মুসলমান হইয়া গিয়াছিল যাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে উতাইবা হযরত উম্মে কুলছুম (রাযিঃ)কে তালাক দেওয়ার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া চরম বেআদবী ও অশোভনীয় কথাবার্তা বলে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বদদোয়া করিলেন যে, হে আল্লাহ! আপনার কুকুরদের মধ্য হইতে একটি কুকুর তাহার উপর নিযুক্ত করিয়া দিন। আবু তালেব তখন জীবিত ছিলেন। মুসলমান না হওয়া সত্ত্বেও ভয় পাইয়া গেলেন এবং বলিলেন যে, তাহার বদদোয়া হইতে তোর রক্ষা নাই। অতঃপর উতাইবা একবার সিরিয়া সফরে যাইতেছিল, তাহার পিতা আবু লাহাব সর্বপ্রকার বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও বলিতে লাগিল যে, আমার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদদোয়ার ভয় হইতেছে। কাফেলার সবাই যেন আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখে। কাফেলা এক মঞ্জিলে পৌছিল যেখানে অনেক বাঘ ছিল। রাত্রে সমস্ত কাফেলার আসবাবপত্র একত্র করিয়া টিলার মত বানাইয়া উহার উপর উতাইবাকে শোয়াইল এবং কাফেলার সমস্ত লোক চারিদিকে শয়ন করিল। রাত্রে একটি বাঘ আসিল এবং সকলের মুখ শুঁকিল। অতঃপর এক লাফে ঐ টিলার উপর পৌছিয়া উতাইবার মাথা দেহ হইতে ছিন্ন করিয়া ফেলিল। সে একটি চিৎকার দিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কাজ শেষ হইয়া গিয়াছিল।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে সে মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। আর এই ঘটনা প্রথম ভাইয়ের সহিত ঘটিয়াছিল। হযরত রোকাইয়্যা (রাযিঃ) ও হযরত উম্মে কুলছুম (রাযিঃ)এর স্বামীদের মধ্য হইতে একজন মুসলমান হইয়াছেন অপরজনের সহিত এই ঘটনা ঘটিয়াছে। এই কারণেই আল্লাহওয়ালাগণের সহিত দুশমনী রাখার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

مَنْ عَادٰى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ

"যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীকে কষ্ট দেয় তাহার প্রতি আমার পক্ষ হইতে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইল।"

হযরত রোকাইয়্যা (রাযিঃ)এর ইন্তিকালের পর ৩য় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে হযরত উম্মে কুলছুম (রাযিঃ)এর বিবাহও হযরত উছমান (রাযিঃ)এর সঙ্গে হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমি উম্মে কুলছুমের বিবাহ উছমানের সহিত আসমানী ওহীর নির্দেশে করাইয়াছি। কোন কোন বর্ণনা মতে হযরত উম্মে কুলছুম (রাযিঃ) এবং হযরত রোকাইয়্যা (রাযিঃ) উভয়ের সম্পর্কে ইহা এরশাদ করিয়াছেন। প্রথম স্বামীর ঘরে যাওয়াই হয় নাই আর হযরত উছমান (রাযিঃ) হইতেও তাঁহার কোন সন্তান হয় নাই। তিনি ৯ম হিজরীর শাবান মাসে ইন্তিকাল করেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার

ইন্তিকালের পর এরশাদ করিয়াছেন, যদি আমার একশত মেয়ে থাকিত আর মৃত্যুবরণ করিত তবে আমি এইভাবে একের পর এক সকলের বিবাহ ওছমান (রাযিঃ)এর সঙ্গে দিতাম।

④ হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চতুর্থ কন্যা জান্নাতী মহিলাদের সর্দার হযরত ফাতেমা (রাযিঃ), যিনি অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে বয়সে সবচেয়ে ছোট। তিনি নবুওতের এক বছর পর যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ৪১ বৎসর ছিল জন্মগ্রহণ করেন। আবার কেহ কেহ নবুয়তের ৫ বছর পূর্বে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ৩৫ বৎসর বয়সে জন্মগ্রহণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

কথিত আছে, তাঁহার নাম ফাতেমা ইলহাম বা ওহীর মাধ্যমে রাখা হইয়াছে। 'ফাত্‌ম' অর্থ, হেফাজত করা। অর্থাৎ, তিনি জাহান্নামের আগুন হইতে হেফাজতপ্রাপ্ত। হিজরী ২য় সনের মুহাররম অথবা সফর অথবা রজব অথবা রমযান মাসে হযরত আলী (রাযিঃ)এর সহিত বিবাহ হয়। বিবাহের সাত মাস পনের দিন পর স্বামীর ঘরে যান। এই বিবাহও আল্লাহ তায়ালার হুকুমে হইয়াছে। উল্লেখ আছে যে, বিবাহকালে তাঁহার বয়স ছিল পনের বছর পাঁচ মাস। ইহা হইতেও তাঁহার জন্ম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ৪১ বছর বয়সে হওয়া প্রমাণিত হয়। আর হযরত আলী (রাযিঃ)এর বয়স ছিল ২১ বছর ৫ মাস অথবা ২৪ বছর দেড় মাস। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কন্যাদের সকলের মধ্যে তাঁহাকে বেশী ভালবাসিতেন। যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে যাইতেন তখন সবশেষে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইতেন আর যখন সফর হইতে ফিরিয়া আসিতেন তখন সর্বপ্রথম তাঁহার কাছে যাইতেন। হযরত আলী (রাযিঃ) আবু জাহলের কন্যার সহিত দ্বিতীয় বিবাহ করিতে চাহিলে তিনি ইহাতে মনক্ষুন্ন হন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ করেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, ফাতেমা আমার শরীরের টুকরা। যে তাহাকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল। এইজন্য হযরত আলী (রাযিঃ) তাঁহার জীবদ্দশায় অন্য কোন বিবাহ করেন নাই। তাঁহার ইন্তিকালের পর তাহার বোনের মেয়ে হযরত উমামা (রাযিঃ)কে বিবাহ করেন। যাহার আলোচনা হযরত যয়নাব (রাযিঃ)এর বর্ণনায় গত

হইয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের ছয় মাস পর হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং একদিন খাদেমাকে বলিলেন, আমি গোসল করিব, পানি আনিয়া রাখ। গোসল করিলেন, নতুন কাপড় পরিলেন অতঃপর বলিলেন, আমার বিছানা ঘরের মাঝখানে করিয়া দাও। তিনি বিছানায় গিয়া কেবলামুখী হইয়া শুইয়া ডান হাত গালের নীচে রাখিলেন এবং বলিলেন, বস্ আমি এখন মরিতেছি। এই বলিয়া ইন্তিকাল করিলেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধারা তাঁহার পক্ষ হইতেই চলিয়াছে এবং ইনশাআল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত চলিতে থাকিবে। তাঁহার ছয় সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে তিনজন ছেলে তিনজন মেয়ে। সর্বপ্রথম হযরত হাসান (রাযিঃ) বিবাহের ২য় বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর ৩য় বৎসরে অর্থাৎ হিজরী ৪র্থ সনে হযরত হোসাইন (রাযিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর মুহাস্‌সিনা (রাযিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৈশবেই মারা যান। কন্যাদের মধ্যে হযরত রোকাইয়্যা (রাযিঃ)এর ইন্তিকাল শৈশবেই হইয়া গিয়াছিল। এই কারণে কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁহার উল্লেখই করেন নাই। দ্বিতীয়া কন্যা হযরত উম্মে কুলছুম (রাযিঃ)। এর প্রথম বিবাহ আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযিঃ)এর সহিত হয়। তাঁহার পক্ষ হইতে এক ছেলে যায়েদ (রাযিঃ) ও এক কন্যা রোকাইয়া (রাযিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। হযরত ওমর (রাযিঃ)এর ইন্তিকালের পর উম্মে কুলছুম (রাযিঃ)এর বিবাহ আউন ইবনে জাফর (রাযিঃ)–এর সহিত হয়। তাঁহার পক্ষ হইতে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই। তাঁহার ইন্তিকালের পর তাঁহার ভাই মুহাম্মদ ইবনে জাফর (রাযিঃ)এর সহিত বিবাহ হয়। তাঁহার পক্ষ হইতে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। যিনি শৈশবেই মারা যান। তাহার ইন্তিকালের পর তাহার তৃতীয় ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের সহিত হয়। তাঁহার পক্ষ হইতেও কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই। তাঁহারই বিবাহে থাকিয়া হযরত উম্মে কুলছুম (রাযিঃ)এর ইন্তিকাল হয়। আর ঐ দিনই তাহার ছেলে যায়েদ (রাযিঃ)এরও ইন্তিকাল হয়। উভয় জানাযা একই সাথে বহন করিয়া নেওয়া হয় এবং বংশের ধারাবাহিকতা তাহার দিক হইতে চলে নাই।

এই তিন ভাই আবদুল্লাহ, আউন ও মুহাম্মদ (রাযিঃ) যাহাদের ঘটনা ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১১ নম্বরে বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা হইলেন—হযরত আলী (রাযিঃ)এর ভাতিজা এবং হযরত জাফর তাইয়্যার (রাযিঃ)এর পুত্র। হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)এর তৃতীয়া কন্যা হযরত যয়নাব (রাযিঃ) ছিলেন।

তাঁহার বিবাহ আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযিঃ)এর সহিত হয়। আবদুল্লাহ ও আউন নামে তাঁহার দুই ছেলে জন্মগ্রহণ করে। আর তাহারই বিবাহে থাকাকালীন ইন্তিকাল করেন। তাঁহার ইন্তিকালের পর আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযিঃ)এর বিবাহ তাহার বোন হযরত উম্মে কুলছুম (রাযিঃ)এর সহিত হইয়াছিল। ইহারা হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)এর সন্তান। ইহা ছাড়া হযরত আলী (রাযিঃ)এর অন্যান্য স্ত্রীদের পক্ষ হইতে আরো সন্তান রহিয়াছে। যাহারা পরবর্তীতে জন্মগ্রহণ করেন। ঐতিহাসিকগণ হযরত আলী (রাযিঃ)এর সর্বমোট সন্তান সংখ্যা বত্রিশজন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ষোলজন ছেলে ও ষোলজন মেয়ে। আর হযরত ইমাম হাসান (রাযিঃ)এর পনেরজন ছেলে ও আটজন মেয়ে এবং হযরত ইমাম হুসাইন (রাযিঃ)এর ছয়জন ছেলে ও তিনজন মেয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

একাদশ অধ্যায়
বাচ্চাদের দ্বীনি জয্‌বা

নবীন ও অল্পবয়স্ক বাচ্চাদের মধ্যে যে দ্বীনি প্রেরণা ছিল তাহা মূলতঃ অভিভাবকদের প্রতিপালনের ফল ছিল। পিতামাতা এবং অন্যান্য অভিভাবকগণ যদি বাচ্চাদেরকে আদর–স্নেহে নষ্ট না করিয়া প্রথম হইতেই তাহাদের দ্বীনি অবস্থার খোঁজখবর রাখেন এবং তাহাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন তবে দ্বীনী বিষয়সমূহ শিশুদের অন্তরে বসিয়া যাইবে এবং বড় হইয়া ঐসব বিষয় তাহাদের জন্য অভ্যাসে পরিণত হইয়া যাইবে। কিন্তু আমরা উহার বিপরীত বাচ্চা মনে করিয়া তাহাদের প্রত্যেক মন্দ কাজকে এড়াইয়া যাই এমনকি অত্যধিক মহবতের কারণে উহাতে খুশি হই আর দ্বীনের ব্যাপারে যত ত্রুটি–বিচ্যুতি দেখি নিজের মনকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দেই যে, বড় হইলে সব ঠিক হইয়া যাইবে। অথচ যে বীজ শুরুতে বপন করা হইয়াছে বড় হইয়া উহা আরও পরিপক্ক হইয়া যায় আপনি ছোলার বীজ বপন করিয়া উহা হইতে গম উৎপন্ন করিতে চাহেন, তাহা অসম্ভব। আপনি যদি চান যে, বাচ্চাদের মধ্যে ভাল অভ্যাস ও চরিত্র সৃষ্টি হউক, দ্বীনের প্রতি যত্নবান হউক এবং দ্বীনদার হউক তবে বাচ্চা বয়সেই তাহাদিগকে দ্বীনের প্রতি যত্নবান হওয়ার অভ্যস্ত করিতে হইবে। সাহাবায়ে

কেরাম (রাযিঃ)গণ শৈশব কাল হইতেই নিজ সন্তানদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন এবং দ্বীনী কাজের অভ্যাস করাইতেন। হযরত ওমর (রাযিঃ)এর খেলাফতকালে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়া আনা হইল। সে রমযান মাসে মদ পান করিয়াছিল এবং রোযা রাখিয়া ছিল না। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, তোর ধ্বংস হউক, আমাদের তো বাচ্চারাও রোযা রাখে। (বুখারী)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ, তুই এত বড় হইয়াও রোযা রাখিস না? অতঃপর তাহাকে শরাব পান করার শাস্তিস্বরূপ আশি চাবুক মারিলেন এবং মদীনা হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার নির্দেশ দিয়া সিরিয়ার দিকে পাঠাইয়া দিলেন।

(১) বাচ্চাদিগকে রোযা রাখানো

রুবাইয়্যে বিনতে মুওয়াউবিয (রাযিঃ) যাহার ঘটনা ১ম অধ্যায়ের শেষ দিকে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করাইলেন যে, আজ আশুরার দিন সবাই যেন রোযা রাখে। উহার পর হইতে আমরা সর্বদা উক্ত তারিখে রোযা রাখিতাম এবং নিজ বাচ্চাদেরকেও রোযা রাখাইতাম। যখন তাহারা ক্ষুধার কারণে কাঁদিতে আরম্ভ করিত তখন আমরা তুলা দিয়া খেলনা তৈরী করিয়া তাহাদিগকে শান্ত করিতাম এবং ইফতারের সময় পর্যন্ত এইভাবে তাহাদিগকে খেলাধূলায় লাগাইয়া রাখিতাম। (বুখারী)

ফায়দা ঃ কোন কোন হাদীসে ইহাও আসিয়াছে যে, মায়েরা দুধপানকারী শিশুদিগকে দুধপান করাইতেন না। যদিও তখনকার মানুষ অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল আর বর্তমান যুগের মানুষ অতি দুর্বল। সে যুগের মানুষ ও তাহাদের বাচ্চাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল, কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যতটুকু করার সামর্থ্য রহিয়াছে ততটুকুই বা কোথায় করা হইতেছে। সামর্থ্যের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কিন্তু এখন যতটুকুর সামর্থ্য আছে ততটুকুর ব্যাপারে ত্রুটি করা অবশ্যই সমীচীন নহে।

(২) হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর হাদীছ বর্ণনা ও আয়াত অবতীর্ণ হওয়া

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) ছয় বছর বয়সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ বন্ধনে আসেন। মক্কা মোকাররমায় বিবাহ হয় এবং নয় বছর বয়সে মদীনা তাইয়্যেবায় স্বামীগৃহে গমন করেন। অতঃপর

আঠার বছর বয়সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকাল হয়। আঠার বছর বয়সই বা কি! কিন্তু এই বয়সেও এত বেশী দ্বীনি মাসায়েল এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও আমলসমূহ তাহার নিকট হইতে বর্ণনা করা হয় যাহার কোন সীমা নাই। মাসরুক (রহঃ) বলেন, আমি বড় বড় সাহাবা (রাযিঃ)দেরকে দেখিয়াছি হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করিতেন। আতা (রহঃ) বলেন, হযরত আয়েশা (রাযিঃ) মাসায়েল সম্পর্কে পুরুষদের চাইতেও বেশী অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী ছিলেন।

হযরত আবু মূসা (রাযিঃ) বলেন, আমরা কোন ইলমী সমস্যার সম্মুখীন হইলে হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর নিকট যাইয়া তাহার সমাধান পাইতাম। (ইসাবাহ) হাদীছ গ্রন্থে তাঁহার নিকট হইতে বর্ণিত দুই হাজার দুই শত হাদীছ পাওয়া যায়। (তালকীহ) তিনি নিজে বলেন, আমি মক্কা মোকাররমায় শৈশবকালে খেলিতেছিলাম। ঐসময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সূরায়ে কামারের এই আয়াত নাযিল হয়—

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) আট বছর বয়স পর্যন্ত মক্কায় থাকিয়াছেন। এত অল্প বয়সে ঐ আয়াত নাযিল হওয়ার বিষয় জানা তারপর আবার মুখস্থও রাখা দ্বীনের সহিত বিশেষ সম্পর্ক থাকার দরুনই সম্ভব হইতে পারে। নচেৎ আট বছর বয়সই বা কতটুকু!

(৩) হযরত উমাইর (রাযিঃ)এর জেহাদে অংশগ্রহণের আগ্রহ

হযরত উমাইর (রাযিঃ) আবিল লাহমের গোলাম ছিলেন এবং কম বয়সের বালক ছিলেন। তখনকার ছোট বড় সকলের নিকট জেহাদে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রাণতুল্য প্রিয় ছিল। তিনি খাইবারের যুদ্ধে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার মনিবরাও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে সুপারিশ করিলেন যে, তাহাকে অনুমতি দেওয়া হউক। সুতরাং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিলেন এবং একটি তরবারী দান করিলেন যাহা তিনি গলায় ঝুলাইয়া লইলেন। কিন্তু তরবারী বড় ও শরীর খাট হওয়ার কারণে উহা যমিনের উপর হেঁচড়াইতেছিল। এই অবস্থায় তিনি খয়বরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যেহেতু ছোট ছিলেন এবং গোলামও ছিলেন এই কারণে গনীমতের পুরা অংশ তো পান নাই তবে দানস্বরূপ কিছু সামান

পাইয়াছেন। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ তাঁহাদের ইহাও জানা ছিল যে, গনীমতের মধ্যে আমাদের জন্য পুরা অংশও নাই। এতদসত্ত্বেও এই পরিমাণ আগ্রহ ছিল যে, অন্যের মাধ্যমে সুপারিশ করাইতেন দ্বীনী প্রেরণা এবং আল্লাহ ও তাঁহার সত্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াদা উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস ছাড়া ইহার আর কি কারণ হইতে পারে?

(৪) হযরত ওমাইর (রাযিঃ)এর বদরের যুদ্ধে আত্মগোপন

হযরত ওমাইর ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাযিঃ) একজন অল্পবয়স্ক সাহাবী ছিলেন। শুরুতেই মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ সাহাবী সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাযিঃ)এর ভাই ছিলেন। হযরত সা'দ (রাযিঃ) বলেন, আমি আমার ভাই উমাইরকে বদরের যুদ্ধের সময় দেখিলাম যখন লশকর রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি চলিতেছিল তখন সে এদিক-ওদিক লুকাইয়া বেড়াইতেছিল। যাহাতে কেহ দেখিয়া না ফেলে। ইহা দেখিয়া আমি আশ্চর্যান্বিত হইলাম, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হইয়াছে লুকাইয়া বেড়াইতেছ কেন? সে বলিতে লাগিল, আমার আশংকা হইতেছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখিয়া ফেলিবেন এবং ছোট মনে করিয়া জেহাদে যাইতে নিষেধ করিয়া দিবেন, ফলে আমি যাইতে পারিব না। আমার আকাংখা যে, আমি অবশ্যই যুদ্ধে শরীক হইব। হয়ত আল্লাহ তায়ালা আমাকেও কোন প্রকারে শাহাদাতের সুযোগ দান করিবেন। অবশেষে যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে দৈন্যদল উপস্থিত হইল তখন যে বিষয়ের আশংকা ছিল উহাই দেখা দিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে অল্পবয়স্ক হওয়ার কারণে নিষেধ করিয়া দিলেন। কিন্তু প্রবল আগ্রহের কারণে সহ্য করিতে পারিলেন না, কাঁদিতে লাগিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার আগ্রহ ও ক্রন্দনের কথা জানিতে পারিয়া অনুমতি দিয়া দিলেন। যুদ্ধে শরীক হইলেন এবং দ্বিতীয় আকাংখাও পূর্ণ হইল। ঐ যুদ্ধেই শহীদ হইলেন। তাঁহার ভাই সা'দ (রাযিঃ) বলেন, তাঁহার ছোট হওয়ার এবং তরবারী বড় হওয়ার কারণে আমি উহার ফিতায় বার বার গিরা লাগাইয়া দিতাম যাহাতে তরবারী উঁচা হইয়া যায়। (ইসাবাহ)

(৫) দুই আনসারী বালকের আবু জাহলকে হত্যা করা

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযিঃ) প্রসিদ্ধ ও বড় সাহাবা

(রাযিঃ)দের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি বলেন, আমি বদরের যুদ্ধের ময়দানে যোদ্ধাদের কাতারে দাঁড়াইয়া ছিলাম। দেখিলাম যে, আমার ডানে এবং বামে দুইজন আনসারী কমবয়স্ক বালক রহিয়াছে। ভাবিলাম যে, আমি যদি শক্তিশালী ও মজবুত লোকদের মাঝে থাকিতাম তবে ভাল হইত কেননা প্রয়োজনে একে অপরের সাহায্য করিতে পারিতাম। আমার দুই পাশে দুইটি বালক উহারা কি সাহায্য করিবে। ইত্যবসরে তাহাদের উভয়ের মধ্য হইতে একজন আমার হাত ধরিয়া বলিল, চাচা! আপনি কি আবু জাহলকে চিনেন? আমি বলিলাম, হাঁ, চিনি। তোমার কি দরকার? সে বলিল, আমি জানিতে পারিয়াছি, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালিগালাজ করে। ঐ পবিত্র সত্তার কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ, যদি আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই তবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার নিকট হইতে পৃথক হইব না যতক্ষণ সে না মরিবে অথবা আমি না মরিব। তাহার প্রশ্নোত্তর শুনিয়া আমি হতবাক হইয়া গেলাম। ইতিমধ্যে দ্বিতীয়জন একই প্রশ্ন করিল এবং প্রথম জন যাহা বলিয়াছিল সেও তাহাই বলিল। ঘটনাক্রমে আমি আবু জাহলকে ময়দানে ছুটাছুটি করিতে দেখিতে পাইলাম। আমি তাহাদের উভয়কে বলিলাম, তোমরা যাহার সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলে তোমাদের সেই কাঙ্খিত ব্যক্তি ঐ যাইতেছে। ইহা শুনামাত্র উভয়ে তরবারী হাতে লইয়া মুহূর্তে ছুটিয়া চলিয়া গেল এবং যাইয়াই তাহার উপর তরবারী চালাইতে শুরু করিল। অবশেষে তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া ফেলিল। (বুখারী)

ফায়দা ঃ এই দুই বালক ছিলেন মুয়ায ইবনে আমর ইবনে জামূহ (রাযিঃ) এবং মুয়ায ইবনে আফরা (রাযিঃ)। মুয়ায ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, আমি লোকদের নিকট শুনিতাম যে, আবু জাহলকে কেহ হত্যা করিতে পারিবে না কারণ, সে অত্যন্ত নিরাপত্তার মধ্যে থাকে। আমার তখন হইতে খেয়াল ছিল যে, আমি তাহাকে হত্যা করিব। এই দুই বালক ছিলেন পদাতিক আর আবু জাহল ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিল। সে সৈন্যদের কাতার ঠিক করিতেছিল। আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযিঃ) দেখিলেন, ইহারা দুইজন ছুটিয়া গেল যেহেতু ঘোড় সওয়ারের উপর সরাসরি আক্রমণ করা মুশকিল ছিল। এইজন্য একজন ঘোড়ার উপর আক্রমণ করিল আর অপরজন আবু জাহলের পায়ের গোছায় আঘাত করিল। ইহাতে ঘোড়াও পড়িয়া গেল এবং আবু জাহলও এমনিভাবে পড়িয়া গেল যে, আর উঠিতে পারিল না। এই দুইজন তাহাকে এমন অবস্থা করিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন যে, সে আর উঠিতে সক্ষম হয় নাই,

সেখানেই পড়িয়া ছটফট করিতে থাকিল। কিন্তু তাহাদের ভাই মুওয়াওবিয ইবনে আফরা (রাযিঃ) তাহাকে আরো একটু ঠাণ্ডা করিয়া দিলেন যাহাতে উঠিয়া চলিয়া যাইতে না পারে। কিন্তু তিনিও সম্পূর্ণরূপে শেষ করিলেন না। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) একেবারে শিরোশ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন।

মুয়ায ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, আমি যখন তাহার পায়ের গোছায় আঘাত করিলাম তখন তাহার পুত্র ইকরিমা সঙ্গে ছিল। সে আমার কাঁধের উপর আঘাত করিল। ইহাতে আমার হাত কাটিয়া গেল এবং শুধু চামড়ার সহিত ঝুলিয়া রহিল। (উসদুল গাবাহ) আমি এই ঝুলন্ত হাতকে পিঠের পিছনে ফেলিয়া রাখিলাম এবং সারাদিন অপরহাতে যুদ্ধ করিতে থাকিলাম কিন্তু যখন উহা ঝুলিয়া থাকার কারণে অসুবিধা হইল তখন আমি উহাকে পায়ের নীচে রাখিয়া জোরে টান মারিলাম যাহাতে ঐ চামড়াও ছিঁড়িয়া গেল যাহার সহিত হাত ঝুলিয়া ছিল। অতঃপর আমি উহাকে দূরে ফেলিয়া দিলাম। (খামীস)

(৬) হযরত রাফে' (রাযিঃ) ও ইবনে জুনদুব (রাযিঃ)এর প্রতিযোগিতা

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল যে, যখন যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হইতেন তখন মদীনা মুনাওয়ারার বাহিরে যাইয়া সৈন্যদল পরিদর্শন করিতেন। তাহাদের অবস্থা, তাহাদের প্রয়োজনসমূহ দেখিতেন এবং সৈন্যদলের সংশোধন করিতেন। অল্পবয়সী বালকদেরকে ফিরাইয়া দিতেন যাহারা অত্যধিক আগ্রহের কারণে বাহির হইয়া পড়িতেন। সুতরাং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উহুদের যুদ্ধে রাওয়ানা হইলেন তখন এক জায়গায় পৌঁছিয়া সৈন্যদল পরিদর্শন করিলেন এবং বালকদিগকে অল্পবয়স হওয়ার কারণে ফেরত পাঠাইয়া দিলেন। তাহাদের মধ্যে নিম্নোক্ত সাহাবীগণ ছিলেন—

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ), যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাযিঃ), উসামা ইবনে যায়েদ (রাযিঃ), যায়েদ ইবনে আরকাম (রাযিঃ), বারা ইবনে আযেব (রাযিঃ), আমর ইবনে হাযাম (রাযিঃ), উসাইদ ইবনে যুহাইর (রাযিঃ), ইরাবা ইবনে আউস (রাযিঃ), আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ), সামুরা ইবনে জুন্দুব (রাযিঃ) ও রাফে' ইবনে খাদীজ (রাযিঃ)। ইঁহাদের বয়স প্রায় তের চৌদ্দ বছরের মত ছিল। যখন তাহাদের প্রতি ফিরিয়া যাওয়ার হুকুম হইল তখন হযরত খাদীজ (রাযিঃ) সুপারিশ করিলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ছেলে রাফে' তীর চালনা খুব

ভালো জানে। আর স্বয়ং রাফে' (রাযিঃ)ও অনুমতি পাওয়ার আগ্রহে পায়ের উপর ভর করিয়া বার বার উঁচু হইয়া দাঁড়াইতেছিলেন যাহাতে লম্বা মনে হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে অনুমতি দিয়া দিলেন। তখন সামুরা ইবনে জুনদুব (রাযিঃ) তাহার সৎ পিতা মুর্‌রা ইবনে সিনানের নিকট বলিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো রাফে (রাযিঃ)কে অনুমতি দান করিলেন আর আমাকে অনুমতি দিলেন না। অথচ আমি রাফে (রাযিঃ)এর চাইতে শক্তিশালী। যদি আমার ও তাহার মধ্যে মোকাবিলা হয় তবে আমি তাহাকে পরাস্ত করিয়া দিব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ের মধ্যে মোকাবিলা করাইলেন। সামুরা (রাযিঃ) রাফে(রাযিঃ)কে সত্যই পরাস্ত করিয়া দিলেন। অতএব হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামুরা (রাযিঃ)কেও অনুমতি দিয়া দিলেন। ইহার পর অন্যান্য বালকরাও চেষ্টা করিলেন এবং আরো অনেকেই অনুমতি পাইয়া গেলেন। এইসব বিষয় সমাধা করিতে করিতে রাত্র হইয়া গেল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র বাহিনীর হেফাজতের ব্যবস্থা করিলেন। পঞ্চাশ জনকে পুরা বাহিনীর পাহারার জন্য নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর এরশাদ করিলেন আমার পাহারাদারী কে করিবে? এক ব্যক্তি দাঁড়াইলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তোমার নাম কি? তিনি বলিলেন, যাকওয়ান। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আচ্ছা বসিয়া যাও। আবার বলিলেন, আমার পাহারাদারী কে করিবে? এক ব্যক্তি দাঁড়াইলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন, আবু সাবু (সাবু এর পিতা)। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বসিয়া যাও। তৃতীয় বার পুনরায় এরশাদ হইল, আমার পাহারাদারী কে করিবে? আবার এক ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি আরজ করিলেন, ইবনে আবদে কাইস (রাযিঃ) (আবদে কাইসের পুত্র)। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আচ্ছা বসিয়া যাও। কিছুক্ষণ পর এরশাদ করিলেন, তিনজনই চলিয়া আস। তখন এক ব্যক্তি হাজির হইলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার দুই সঙ্গী কোথায় গিয়াছে? তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিন বারই আমিই দাঁড়াইয়াছিলাম। হুযূর (সাঃ) তাঁহাকে দোয়া দিলেন এবং পাহারার হুকুম দিলেন। সারারাত্র তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাঁবু পাহারা দিলেন। (খামীস)

ফায়দা ঃ এই ছিল তাহাদের আগ্রহ ও উদ্দীপনা। ছোট বড় প্রত্যেকেই এমনই আত্মহারা ছিলেন যে, প্রাণ উৎসর্গ করাই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এইজন্যই কামিয়াবী ও সফলতা তাঁহাদের পদচুম্বন করিত। হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রাযিঃ) বদরের যুদ্ধেও নিজেকে পেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন অনুমতি পাইয়াছিলেন না। পুনরায় উহুদের যুদ্ধে নিজেকে পেশ করিলেন যাহার আলোচনা এখন করা হইল। ইহার পর হইতে প্রত্যেক যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করিতে থাকেন। উহুদের যুদ্ধে তাঁহার বুকে একটি তীর বিদ্ধ হয়। যখন উহাকে টান দেওয়া হইল তখন তীরের সম্পূর্ণ অংশ বাহির হইয়া আসিল কিন্তু ফলার অংশ কিছুটা ভিতরে থাকিয়া গেল। যাহা যখমের রূপ ধারণ করিয়া রহিল। শেষ জীবনে বার্ধক্যের কাছাকাছি এই জখমই তাজা হইয়া তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল।

(উসদুল গাবাহ)

(৭) কুরআনের কারণে হযরত যায়েদ (রাযিঃ)এর অগ্রগণ্য হওয়া

হিজরতের সময় হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাযিঃ)এর বয়স এগার বছর ছিল। তিনি ছয় বছর বয়সে এতীম হইয়া গিয়াছিলেন। বদরের যুদ্ধে স্বেচ্ছায় নিজেকে পেশ করেন কিন্তু অনুমতি মিলে নাই। পুনরায় উহুদের যুদ্ধে বাহির হইলেন। কিন্তু ফিরাইয়া দেওয়া হইল। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, যেহেতু সামুরা (রাযিঃ) ও রাফে (রাযিঃ) উভয়েরই অনুমতি হইয়াছিল যেমন এই মাত্র পূর্বের ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে এই কারণে তাঁহাকেও অনুমতি দেওয়া হয়। ইহার পর হইতে প্রত্যেক যুদ্ধেই শরীক হইতে থাকেন। তবুকের যুদ্ধে বনু মালেকের ঝাণ্ডা হযরত উমারা (রাযিঃ)এর হাতে ছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমারা (রাযিঃ) হইতে লইয়া হযরত যায়েদ (রাযিঃ)কে দিয়া দিলেন। উমারা (রাযিঃ) চিন্তিত হইলেন, সম্ভবতঃ আমার দ্বারা কোন ত্রুটি হইয়া গিয়াছে অথবা কোন অসন্তুষ্টির কারণ ঘটিয়াছে। তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ব্যাপারে আপনার কাছে কোন অভিযোগ আসিয়াছে কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, না, ব্যাপার ইহা নহে। বরং যায়েদ তোমার চেয়ে কুরআন শরীফ বেশী পড়িয়াছে। কুরআন তাঁহাকে ঝাণ্ডা বহনে অগ্রগণ্য করিয়া দিয়াছে।

(উসদুল গাবাহ)

ফায়দা ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ অভ্যাস ছিল, মর্যাদার ব্যাপারে দ্বীন অনুপাতে অগ্রাধিকার দিতেন। এখানে যদিও

যুদ্ধের ব্যাপার ছিল ঝাণ্ডা বহনে কুরআন শিক্ষায় বেশী হওয়ার কোন দখল ছিল না। এতদসত্ত্বেও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন অধিক জানার কারণে অগ্রাধিকার দিয়াছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। এমনকি কোন কারণে যদি একাধিক লোককে একই কবরে দাফন করিতে হইত তবে যাহার কুরআন অধিক জানা থাকিত তাহাকে অগ্রাধিকার দিতেন। যেমন উহুদের যুদ্ধে করিয়াছেন।

(৮) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)এর পিতার ইন্তেকাল

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমাকে উহুদের যুদ্ধের জন্য পেশ করা হইল। আমার বয়স ছিল তের বছর। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবুল করিলেন না। আমার পিতা সুপারিশও করিলেন যে, তাহার যথেষ্ট শক্তি আছে এবং হাড়ও মোটা আছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে দৃষ্টি উঠাইতেছিলেন আবার নামাইতেছিলেন। অবশেষে অল্পবয়সের কারণে অনুমতি দিলেন না। আমার পিতা ঐ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিলেন এবং শহীদ হইয়া গেলেন। কোন ধনসম্পদ কিছুই ছিল না। আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে কিছু চাওয়ার উদ্দেশ্যে হাজির হইলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখিয়া এরশাদ করিলেন, যে সবর চায় আল্লাহ তাহাকে সবর দান করেন, যে আল্লাহ তায়ালার নিকট পবিত্রতা চায় আল্লাহ তাহাকে পবিত্র করিয়া দেন। আর যে ব্যক্তি সচ্ছলতা চায় আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সচ্ছলতা দান করেন। আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই কথাগুলি শুনিয়া আর কিছু না চাহিয়াই চুপচাপ ফিরিয়া আসিলাম। ইহার পর আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে ঐ মর্যাদা দান করিলেন যে, কম বয়সের সাহাবীগণের মধ্যে তাঁহার মত বড় মর্তবার আলেম আরেকজন পাওয়া অত্যন্ত দুস্কর ব্যাপার। (ইসাবাহ, ইস্তীআব)

ফায়দা ঃ বাচ্চা বয়স, তদুপরি পিতার শোক ছাড়াও অভাবের সময়, তথাপি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সাধারণ উপদেশ শুনিয়া চুপচাপ চলিয়া আসা এবং নিজের পেরেশানী প্রকাশও না করা আজকাল কোন পূর্ণবয়স্ক লোকও করিতে পারিবে কি? আসল কথা হইল, আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূলের সাহচর্যের জন্য এমন লোকদেরকেই নির্বাচন করিয়াছিলেন যাহারা ইহার যোগ্য ছিলেন।

এইজন্যই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মানুষের মধ্য হইতে আমার সাহাবীদিগকে বাছাই করিয়াছেন। (বিস্তারিত বর্ণনা পরিশিষ্টে আসিতেছে।)

(৯) গাবায় হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রাযিঃ)এর দৌড়

গাবা মদীনা তাইয়্যেবাহ হইতে চার পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত একটি আবাদী ছিল। সেখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু উট চরিত। কাফেরদের একদল লোকসহ আবদুর রহমান ফাযারী উটসমূহ লুট করিয়া নিল, উটের রাখালকে হত্যা করিয়া ফেলিল। এই লুটতরাজকারীরা ঘোড়ায় সওয়ার ছিল এবং সশস্ত্র ছিল। ঘটনাক্রমে হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রাযিঃ) সকালবেলায় তীর ধনুক লইয়া পায়ে হাটিয়া গাবার দিকে যাইতেছিলেন। হঠাৎ লুটেরাদের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। বালক ছিলেন এবং খুব দৌড়াইতে পারিতেন। কথিত আছে, তাহার দৌড় অতুলনীয় ও প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি দৌড়াইয়া ঘোড়াকে ধরিয়া ফেলিতেন, কিন্তু ঘোড়া তাঁহাকে ধরিতে পারিত না। সেই সঙ্গে তীর চালনায়ও প্রসিদ্ধ ছিলেন। হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রাযিঃ) একটি পাহাড়ে আরোহণ করিয়া মদীনার দিকে মুখ করিয়া লুটতরাজের কথা ঘোষণা করিয়া দিলেন। তীর-ধনুক তো সাথে ছিলই, স্বয়ং ঐ সকল লুটেরাদের ধাওয়া করিলেন। এমন কি তাহাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেলেন এবং তীর ছুঁড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং এমন দ্রুত একের পর এক তীর ছুঁড়িলেন যে, তাহারা ভাবিল যে, বিরাট দল রহিয়াছে। যেহেতু তিনি একা ছিলেন এবং পায়দলও ছিলেন এইজন্য যখন কেহ ঘোড়া ফিরাইয়া তাঁহার দিকে আসিত তখন তিনি কোন গাছের আড়ালে লুকাইয়া যাইতেন এবং আড়াল হইতে তাহার ঘোড়াকে তীর মারিতেন। ইহাতে ঘোড়া আহত হইত আর সেই ব্যক্তি এই মনে করিয়া ফিরিয়া যাইত যে, যদি ঘোড়া পড়িয়া যায় তাহলে আমি ধরা পড়িয়া যাইব। হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রাযিঃ) বলেন, মোটকথা, তাহারা পালাইতে থাকিল আর আমি ধাওয়া করিতে থাকিলাম। এমনকি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে উটগুলি তাহারা লুট করিয়াছিল উহা আমার পিছনে পড়িয়া গেল ইহা ছাড়া তাহারা নিজেদের ত্রিশটি বর্শা এবং ত্রিশটি চাদরও ফেলিয়া গেল। এমন সময় উয়াইনা ইবনে হিসন একটি দলসহ সাহায্যের জন্য তাহাদের নিকট পৌঁছিয়া গেল। ইহাতে উক্ত লুণ্ঠনকারীদের শক্তি বাড়িয়া গেল। আর ইহাও তাহারা জানিতে পারিল যে, আমি একা।

তাহারা কয়েকজন মিলিয়া আমার পিছনে ধাওয়া করিল। আমি একটি পাহাড়ের উপর উঠিয়া গেলাম। তাহারাও উঠিল। তাহারা যখন আমার নিকটে আসিয়া গেল তখন আমি উচ্চস্বরে বলিলাম, একটু থাম প্রথমে আমার একটি কথা শুন। তোমরা কি আমাকে চিন, আমি কে? তাহারা বলিল, বল তুমি কে? আমি বলিলাম, আমি ইবনে আকওয়া। ঐ পবিত্র সত্তার কসম, যিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান দান করিয়াছেন, তোমাদের মধ্য হইতে কেহ যদি আমাকে ধরিতে চায় তবে ধরিতে পারিবে না। আর আমি যদি তোমাদের কাহাকেও ধরিতে চাই তবে আমার হাত হইতে সে কখনও ছুটিতে পারিবে না। যেহেতু তাঁহার সম্পর্কে সাধারণভাবে ইহা প্রসিদ্ধ ছিল যে, তিনি খুব বেশী দৌড়াইতে পারেন। এমনকি আরবী ঘোড়াও তাঁহার মোকাবিলা করিতে পারে না। কাজেই এইরূপ দাবী কোন আশ্চর্য কিছু ছিল না। সালামা (রাযিঃ) বলেন, আমি এইভাবে তাহাদের সহিত কথাবার্তা বলিতে থাকি আর আমার উদ্দেশ্য ছিল তাহাদের নিকট তো সাহায্য পৌঁছিয়া গিয়াছে; মুসলমানদের পক্ষ হইতে আমার সাহায্যও আসিয়া পৌঁছুক। কারণ, আমি মদীনায় ঘোষণা করিয়া আসিয়াছিলাম।

মোটকথা, আমি তাহাদের সহিত ঐভাবে কথাবার্তা বলিতেছিলাম আর গাছের ফাঁক দিয়া মদীনা মুনাওয়ারার দিকে গভীর দৃষ্টিতে দেখিতেছিলাম। হঠাৎ ঘোড়সওয়ারদের একটি দল দৌড়াইয়া আসিতে দেখিলাম। তাহাদের মধ্যে সকলের আগে আখরাম আসাদী (রাযিঃ) ছিলেন। তিনি আসা মাত্রই আবদুর রহমান ফাযারীর উপর হামলা করিলেন। আবদুর রহমানও তাঁহার উপর হামলা করিল। তিনি আবদুর রহমানের ঘোড়ার উপর আক্রমণ করিয়া উহার পা কাটিয়া ফেলিলেন। ইহাতে ঘোড়া পড়িয়া গেল। আবদুর রহমান পড়িতে পড়িতে তাহার উপর হামলা করিয়া দিল। ইহাতে তিনি শহীদ হইয়া গেলেন। আবদুর রহমান তৎক্ষণাৎ তাঁহার ঘোড়ার উপর সওয়ার হইয়া গেল। তাঁহার পিছনে আবু কাতাদা (রাযিঃ) ছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আক্রমন শুরু করিয়া দিলেন। আবদুর রহমান আবু কাতাদা (রাযিঃ)এর ঘোড়ার পায়ের উপর আঘাত করিল যাহার ফলে ঘোড়া পড়িয়া গেল এবং আবু কাতাদা (রাযিঃ) পড়িতে পড়িতে আবদুর রহমানের উপর আক্রমণ করিলেন, ফলে সে নিহত হইল। অতঃপর আবু কাতাদা (রাযিঃ) সঙ্গে সঙ্গে ঐ ঘোড়ার উপর যাহা আখরাম আসাদী (রাযিঃ)এর কাছে ছিল এবং এখন যাহার উপর আবদুর রহমান সাওয়ার ছিল চড়িয়া বসিলেন। (আবূ দাউদ)

ফায়দা ঃ কোন কোন ইতিহাস গ্রন্থে লেখা আছে যে, হযরত সালামা (রাযিঃ) আখরাম আসাদী (রাযিঃ)কে আক্রমণ করিতে বাধাও দিয়াছিলেন যে, একটু অপেক্ষা করুন আমাদের দলের আরও লোকদের আসিতে দিন। কিন্তু তিনি বলিলেন, আমাকে শহীদ হইতে দাও। বর্ণিত আছে যে, মুসলমানদের মধ্যে একমাত্র তিনিই শাহাদত বরণ করেন এবং কাফেরদের বহু লোক এই যুদ্ধে মারা যায়। ইহার পর মুসলমানদের বিরাট দল আসিয়া পৌঁছে এবং তাহারা (কাফেররা) পালাইয়া যায়। সালামা (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করিলেন যে, আমার সঙ্গে একশত লোক দিন আমি তাহাদের ধাওয়া করিব। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, তাহারা নিজেদের দলে পৌঁছিয়া গিয়াছে।

অধিকাংশ ইতিহাস গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, হযরত সালামা (রাযিঃ)এর বয়স তখন বার কি তের বছর ছিল। বার–তের বছরের বালকের ঘোড় সওয়ারদের এক বিরাট দলকে এইভাবে পালাইতে বাধ্য করে যে, তাহারা দিশাহারা হইয়া পড়ে। যাহা কিছু লুঠ করিয়াছিল উহাও ছাড়িয়া যায়, এমনকি নিজেদেরও সামানপত্র ছাড়িয়া যায়। ইহা ঐ এখলাসের বরকত ছিল যাহা আল্লাহ তায়ালা উক্ত জামাতকে দান করিয়াছিলেন।

(১০) বদরের যুদ্ধ এবং হযরত বারা (রাযিঃ)এর আগ্রহ

বদরের যুদ্ধ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ছিল। কেননা ইহাতে মোকাবিলা বড় কঠিন ছিল আর মুসলমানদের সংখ্যাও ছিল অতি নগন্য। সর্বমোট তিনশত পনের জন লোক ছিলেন। যাহাদের নিকট মাত্র তিনটি ঘোড়া, ছয় অথবা নয়টি লৌহবর্ম এবং আটটি তরবারী ও সত্তরটি উট ছিল। এক একটি উটের উপর পালাক্রমে কয়েকজন সওয়ার হইতেন এবং কাফেরদের সংখ্যা প্রায় এক হাজার ছিল। যাহাদের সঙ্গে একশত ঘোড়া, সাতশত উট এবং প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধের সামান ছিল। এইজন্য তাহারা অত্যন্ত নিশ্চিন্তমনে বাদ্যযন্ত্র এবং গায়িকা স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিল। অপরদিকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। কেননা, মুসলমানগণ খুবই দুর্বল অবস্থায় ছিলেন। যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় দলের অবস্থা অনুমান করিলেন তখন দোয়া করিলেন, "হে আল্লাহ! এই সমস্ত মুসলমান নগ্ন পা, আপনিই ইহাদের সওয়ারী দানকারী। ইহারা বস্ত্রহীন,

আপনিই ইহাদের বস্ত্রদানকারী। ইহারা ক্ষুধার্ত, আপনিই ইহাদের অন্নদানকারী। ইহারা অভাবগ্রস্ত, আপনিই ইহাদেরকে সচ্ছলতা দানকারী।"

সুতরাং এই দোয়া কবুল হইল। এরূপ অবস্থা সত্ত্বেও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) ও হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযিঃ) উভয়ে যুদ্ধে শরীক হওয়ার আগ্রহে ঘর হইতে রওয়ানা হইয়া পড়িলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদিগকে অল্পবয়স্ক হওয়ার কারণে রাস্তা হইতে ফিরাইয়া দিলেন। (খামীস) এই উভয়জনকে উহুদের যুদ্ধ হইতেও ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। যেমন প্রথম ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে। উহুদের যুদ্ধ বদরের যুদ্ধের একবছর পর হইয়াছে। যখন উহাতেও বাচ্চাদের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। সেক্ষেত্রে বদরে তো আরও বেশী বাচ্চা ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অত্যন্ত আগ্রহ ছিল, কেননা ছোটবেলা হইতেই এই আগ্রহ ও চেতনা অন্তরে ঢেউ খেলিত। তাই প্রত্যেক জেহাদে শরীক হওয়ার এবং অনুমতি লাভের চেষ্টা করিতেন।

(১১) হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ)এর আপন পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের সহিত আচরণ

৫ম হিজরীতে বনুল মুসতালিকের বিখ্যাত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উহাতে একজন মুহাজের ও একজন আনসারীর মধ্যে পরস্পর লড়াই হইয়া গেল। সাধারণ বিষয় ছিল কিন্তু বড় আকার ধারণ করিল। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কওমের নিকট অপরের বিরুদ্ধে সাহায্য চাহিল। উভয় পক্ষে দল সৃষ্টি হইয়া গেল এবং পরস্পর যুদ্ধ বাঁধিয়া যাওয়ার উপক্রম হইল। এমন সময় কিছু লোক মধ্যস্থতা করিয়া উভয় দলের মধ্যে সন্ধি করাইয়া দিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফেকদের সর্দার ও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ মুনাফেক এবং মুসলমানদের ঘোর বিরোধী ছিল কিন্তু নিজেকে মুসলমান বলিয়া প্রকাশ করিত বিধায় তাহার সহিত খারাপ আচরণ করা হইত না। আর ঐ সময় মুনাফেকদের সহিত সাধারণতঃ এই ব্যবহারই করা হইত। সে যখন এই ঘটনার খবর শুনিতে পাইল তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে বেআদবীমূলক উক্তি করিল এবং আপন বন্ধুদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল, এই সমস্ত কিছু তোমাদেরই কর্মফল। তোমরা তাহাদিগকে নিজেদের শহরে স্থান দিয়াছ, নিজেদের সম্পদসমূহকে তাহাদের মধ্যে সমান ভাগে বন্টন করিয়া দিয়াছ। তোমরা যদি তাহাদের সাহায্য করা বন্ধ করিয়া দাও তবে এখনও তাহারা চলিয়া যাইবে এবং ইহাও বলিল যে, আল্লাহর কসম! আমরা যদি মদীনায় পৌঁছিয়া যাই তবে

আমরা সম্মানী ব্যক্তিগণ মিলিয়া এইসব অপদস্থ লোকদেরকে সেখান হইতে বাহির করিয়া দিব। হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাযিঃ) অল্পবয়স্ক বালক ছিলেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইহা শুনিয়া সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম! তুই অপদস্থ। তোকে তোর গোত্রের মধ্যেও তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখা হয়। তোর কোন সাহায্যকারী নেই। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজ্জত ও সম্মানের অধিকারী। রাহমান অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতেও সম্মান দান করা হইয়াছে এবং আপন গোত্রের মধ্যেও তিনি সম্মানিত।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বলিল, আরে! চুপ থাক। আমি তো এমনিই ঠাট্টা করিয়া বলিতেছিলাম। কিন্তু হযরত যায়েদ (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া বলিয়া দিলেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) আবেদনও করিলেন যে, এই কাফেরের গর্দান উড়াইয়া দেওয়া হউক। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দান করিলেন না। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যখন জানিতে পারিল যে, এই ঘটনা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছিয়া গিয়াছে তখন সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া মিথ্যা কসম খাইতে লাগিল যে, আমি এইরূপ কোন শব্দ বলি নাই। যায়েদ মিথ্যা কথা বলিয়াছে। আনসারদের মধ্য হইতেও কিছু লোক খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। তাহারাও সুপারিশ করিলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবদুল্লাহ গোত্রের সর্দার ও একজন সম্মানী ব্যক্তি। একটি ছেলের কথা তাহার বিরুদ্ধে গ্রহণযোগ্য নহে। হইতে পারে ভুল শুনিয়াছে অথবা ভুল বুঝিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সাফাই গ্রহণ করিয়া নিলেন। হযরত যায়েদ (রাযিঃ) যখন এইকথা জানিতে পারিলেন যে, সে মিথ্যা কসম খাইয়া নিজেকে সত্যবাদী এবং যায়েদ (রাযিঃ)কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়াছে তখন লজ্জায় বাহির হওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। লজ্জায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতেও উপস্থিত হইতে পারিলেন না।

অবশেষে সূরায়ে মুনাফিকুন নাযিল হইল, যাহা দ্বারা হযরত যায়েদ (রাযিঃ)এর সত্যবাদিতা এবং আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মিথ্যা কসমের অবস্থা প্রকাশ পাইয়া গেল। পক্ষ-বিপক্ষ সকলের দৃষ্টিতেই হযরত যায়েদ (রাযিঃ)এর মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল এবং আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর ঘটনাও সকলের নিকট প্রকাশ হইয়া গেল। যখন মদীনা মুনাওয়ারা নিকটবর্তী হইল তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর পুত্র যাহার নামও আবদুল্লাহ ছিল

এবং বড় খাঁটি মুসলমান ছিলেন মদীনা মুনাওয়ারার বাহিরে তরবারী উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন আর পিতাকে বলিতে লাগিলেন যে, ঐ সময় পর্যন্ত মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করিতে দিব না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এই কথা স্বীকার না করিবে যে, তুমিই অপদস্থ আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মানিত। সে আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেল যে, এই ছেলে তো সর্বদাই পিতার সহিত অত্যন্ত সম্মানসুলভ ও উত্তম আচরণ করিত কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোকাবিলায় সহ্য করিতে পারিলেন না। অবশেষে সে বাধ্য হইয়া ইহা স্বীকার করিল যে, আল্লাহর কসম আমি অপদস্থ আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মানিত। ইহার পর মদীনায় প্রবেশ করিতে পারিল। (খামীস)

(১২) হামরাউল আসাদ নামক যুদ্ধে হযরত জাবের (রাযিঃ)এর অংশগ্রহণ

উহুদের যুদ্ধ হইতে অবসর হইয়া মুসলমানগণ মদীনা তাইয়্যেবায় পৌছিলেন। সফর এবং যুদ্ধের ক্লান্তি যথেষ্ট ছিল। কিন্তু মদীনা মুনাওয়ারায় পৌছা মাত্রই এই সংবাদ পাইলেন যে, আবু সুফিয়ান যুদ্ধ হইতে ফিরিবার পথে হামরাউল আসাদ নামক স্থানে পৌছিয়া সঙ্গীদের সহিত পরামর্শ করিয়াছেন এবং এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় হইয়াছে এইরূপ সুযোগের সদ্ব্যবহার করা উচিত ছিল। কেননা এমন সুযোগ পুনরায় আর আসিবে কিনা জানা নাই। এইজন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নাউজুবিল্লাহ হত্যা করিয়া ফিরিয়া আসা উচিত ছিল। এই উদ্দেশ্যে সে পুনরায় হামলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যাহারা উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিল তাহারাই শুধু যাইবে এবং পুনরায় হামলা করিবার জন্য যাইতে হইবে। যদিও মুসলমানগণ ঐ সময় ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত ছিলেন কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সকলেই প্রস্তুত হইয়া গেলেন। যেহেতু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে, শুধু যাহারা উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছে তাহারাই যাইবে তাই হযরত জাবের (রাযিঃ) আবেদন করিলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিবারও আকাংখা ছিল কিন্তু আমার পিতা এই বলিয়া অনুমতি দেন নাই যে, আমার সাতটি বোন রহিয়াছে, অন্য কোন পুরুষ নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমাদের উভয়ের মধ্যে হইতে একজনকে অবশ্যই থাকিতে হইবে। আর তিনি নিজে

যাওয়ার সিদ্ধান্ত লইয়া ফেলিয়াছিলেন এই কারণে আমাকে অনুমতি দিয়াছিলেন না। উহুদের যুদ্ধে তিনি শহীদ হইয়া গিয়াছেন। এখন আমাকে আপনার সহিত যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দান করুন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দান করিলেন। তিনি ব্যতীত এমন আর কোন ব্যক্তি যান নাই যিনি উহুদের যুদ্ধে শরীক হন নাই।

(খামীস)

ফায়দা ঃ হযরত জাবের (রাযিঃ)এর এইরূপ আগ্রহ ও আকাংখা সহকারে অনুমতি চাওয়া কতই না ঈর্ষাযোগ্য যে, মাত্র পিতার ইন্তিকাল হইয়াছে, পিতার যিম্মায় করজও অনেক বেশী। তাহাও আবার ইহুদী হইতে লওয়া হইয়াছিল যে অত্যন্ত কঠোর আচরণ করিত এবং বিশেষভাবে তাহার সহিত কঠোর ব্যবহার করিতেছিল। ইহা ছাড়াও বোনদের ভরণপোষণের চিন্তা, কেননা পিতা সাতটি বোনও রাখিয়া গিয়াছেন। যাহাদের কারণে পিতা তাহাকে উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতিও দিয়াছিলেন না। যাহাদের কারণে উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই সবকিছুর উপর জেহাদের প্রেরণা ছিল প্রবল।

(১৩) রোমের যুদ্ধে হযরত ইবনে যুবাইর (রাযিঃ)এর বীরত্ব

হিজরী ২৬ সনে হযরত উছমান (রাযিঃ)এর খেলাফত আমলে মিশরের প্রথম গভর্নর হযরত আমর ইবনে আ'স (রাযিঃ)এর স্থলে আবদুল্লাহ ইবনে আবি সারাহ (রাযিঃ) শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য বিশ হাজারের একটি সৈন্যদল সহ বাহির হইলেন। রোমক সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় দুই লক্ষ। প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। রোমক সেনাপতি জারজীর ঘোষণা করিল যে, আবদুল্লাহ ইবনে আবি সারাহকে যে ব্যক্তি হত্যা করিবে তাহার সহিত আমার কন্যাকে বিবাহ দিব এবং এক লক্ষ দীনার পুরস্কারও দিব। এই ঘোষণার কারণে মুসলমানদের মধ্যে কেহ কেহ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ) জানিতে পারিয়া বলিলেন, চিন্তার কারণ নাই। আমাদের পক্ষ হইতেও ঘোষণা করিয়া দেওয়া হউক যে, যে ব্যক্তি জারজীরকে হত্যা করিবে তাহার সহিত জারজীরের কন্যাকে বিবাহ দেওয়া হইবে এবং এক লক্ষ দীনার পুরস্কার দেওয়া হইবে। উপরন্তু তাহাকে ঐ সমস্ত শহরের আমীরও বানাইয়া দেওয়া হইবে।

মোটকথা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত লড়াই চলিতে থাকে। হযরত আবদুল্লাহ

(রাযিঃ) দেখিলেন যে, জারজীর সৈন্যদলের পিছনে রহিয়াছে এবং সৈন্যরা তাহার সামনে রহিয়াছে। দুইজন বাঁদী তাহাকে ময়ূরের পাখা দ্বারা ছায়াদান করিতেছে। তিনি অতর্কিতে সৈন্যদল হইতে সরিয়া একাকী যাইয়া তাহার উপর হামলা করিলেন। সে ভাবিতেছিল যে, এই লোকটি একা আসিতেছে হয়ত কোন সন্ধির খবর লইয়া আসিতেছে। কিন্তু তিনি সোজা নিকটে পৌছিয়া তাহার উপর হামলা করিয়া দিলেন এবং তরবারী দ্বারা শিরোচ্ছেদ করিয়া বর্শার মাথায় উঠাইয়া লইয়া আসিলেন। সবাই হতবাক হইয়া শুধু দেখিতেই রহিয়া গেল।

ফায়দা ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ) অল্প বয়স্কই ছিলেন। হিজরতের পর মুহাজিরদের মধ্যে প্রথম সন্তান তিনিই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মগ্রহণে মুসলমানগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। কেননা, এক বৎসর যাবৎ কোন মুহাজিরের কোন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই। তখন ইহুদীরা বলিয়াছিল যে, আমরা মুহাজিরদের উপর যাদু করিয়াছি, তাহাদের পুত্র সন্তান জন্মলাভ করিবে না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণতঃ বাচ্চাদেরকে বায়াত করিতেন না। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ)কে সাত বৎসর বয়সে বায়াত করিয়াছিলেন। উক্ত যুদ্ধের সময় তাঁহার বয়স ছিল চব্বিশ কি পঁচিশ বৎসর। এই বয়সে দুই লক্ষ সৈন্যের বাধা ডিঙাইয়া এইভাবে সেনাপতির শির কাটিয়া আনা সাধারণ ব্যাপার নহে।

(১৪) কুফর অবস্থায় হযরত আমর ইবনে সালামা (রাযিঃ)এর কুরআন পাক মুখস্থ করা

আমর ইবনে সালামা (রাযিঃ) বলেন, আমরা মদীনা তাইয়্যেবার পথে এক জায়গায় বসবাস করিতাম। মদীনায় যাতায়াতকারীগণ আমাদের নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেন। যাহারা মদীনা মুনাওয়ারাহ হইতে ফিরিয়া আসিতেন আমরা তাহাদের নিকট অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতাম, সেখানকার লোকদের কি অবস্থা, যে ব্যক্তি নবুওয়তের দাবী করিতেছেন তাহার কি খবর? তাহারা অবস্থা বর্ণনা করিতেন যে, তিনি বলেন, আমার উপর ওহী আসে এবং এই সমস্ত আয়াত নাযিল হইয়াছে। আমি অল্পবয়স্ক বালক ছিলাম তাহারা যাহা বলিত তাহা মুখস্থ করিয়া ফেলিতাম। এইভাবে মুসলমান হওয়ার আগেই আমার বেশ পরিমাণ কুরআন শরীফ মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। আরবের সমস্ত লোকেরা মুসলমান হওয়ার জন্য মক্কাবাসীদের অপেক্ষা করিতেছিল। যখন মক্কা বিজয় হইয়া গেল তখন প্রত্যেক গোত্র

ইসলাম গ্রহণ করিবার জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল। আমার পিতাও আপন গোত্রের কিছুসংখ্যক লোকসহ গোত্রের প্রতিনিধি হইয়া খেদমতে হাজির হইলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে শরীয়তের আহকামসমূহ বলিয়া দিলেন, নামায শিখাইলেন, জামাতে নামায আদায় করিবার নিয়ম বর্ণনা করিলেন এবং এরশাদ করিলেন যে, তোমাদের মধ্যে কুরআন শরীফ যাহার বেশী পরিমাণে মুখস্থ আছে সেই ইমামতির জন্য উত্তম। আমি যেহেতু আগন্তুকদের নিকট হইতে সবসময় কুরআনের আয়াতসমূহ শুনিয়া মুখস্থ করিয়া ফেলিতাম এইজন্য আমারই সবচেয়ে বেশী পরিমাণ কুরআন শরীফ মুখস্থ ছিল। সকলেই খোঁজ লইয়া দেখিল যে, গোত্রের মধ্যে আমার চাইতে অধিক কুরআন আর কাহারো মুখস্থ নাই। তখন তাহারা আমাকেই ইমাম বানাইয়া লইল। তখন আমার বয়স ছিল ছয় কি সাত বৎসর। কোন অনুষ্ঠান হইলে অথবা জানাযার নামাযের প্রয়োজন হইলে আমাকেই ইমাম বানানো হইত। (বুখারী, আবূ দাউদ)

ফায়দা ঃ ইহা দ্বীনের প্রতি স্বভাবগত ঝোঁক ও আসক্তির ফল ছিল যে, এই বয়সে মুসলমান হওয়ার পূর্বেই কুরআন শরীফের বহু অংশ মুখস্থ করিয়া ফেলেন। বাকী বাচ্চা ছেলের ইমামতির বিষয়। ইহা একটি মাসআলা সংক্রান্ত ব্যাপার। যাহাদের মতে জায়েয আছে তাহাদের নিকট আপত্তি নাই। আর যাহাদের মতে জায়েয নহে তাহারা বলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু তাহাদের অর্থাৎ বালেগ ও বয়স্কদেরকেই বলিয়াছিলেন যে, তোমাদের মধ্য হইতে যাহার কুরআন অধিক মুখস্থ আছে। ইহা দ্বারা বাচ্চাগণ উদ্দেশ্য ছিল না।

(১৫) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)এর আপন গোলামের পায়ে বেড়ি পরানো

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)এর গোলাম হযরত ইকরিমা (রহঃ) বিখ্যাত আলেম ছিলেন। তিনি বলেন, আমার মনিব আমাকে কুরআন-হাদীস ও শরীয়তের আহকাম শিখানোর জন্য আমার পায়ে বেড়ি পরাইয়া দিয়াছিলেন যাহাতে কোথাও যাওয়া-আসা করিতে না পারি। তিনি আমাকে কুরআন শরীফ পড়াইতেন ও হাদীস শরীফ পড়াইতেন। (বুখারী, ইবনে সা'দ)

ফায়দা ঃ প্রকৃতপক্ষে পড়াশুনা এইভাবেই হইতে পারে। যাহারা পড়াশুনার সময় ঘুরাফেরা এবং হাটে-বাজারে বেড়াইতে আগ্রহী তাহারা

অনর্থক জীবন বরবাদ করে। এই কারণেই গোলাম ইকরিমা হযরত ইকরিমায় রূপান্তরিত হইলেন এবং বাহরুল উম্মাহ, হিবরুল উম্মাহ এই উপাধিতে মানুষ তাহাকে স্মরণ করিতে লাগিল। কাতাদা (রাযিঃ) বলেন, সমস্ত তাবেয়ীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আলেম চারজন, তন্মধ্যে হযরত ইকরিমা (রহঃ) একজন।

(১৬) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)এর শৈশবে কুরআন হিফয করা

স্বয়ং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, আমার কাছে তাফসীর জিজ্ঞাসা কর। আমি বাল্যকালে কুরআন শরীফ হিফয করিয়াছি। অপর এক হাদীসে আছে, আমি দশ বৎসর বয়সে সর্বশেষ মঞ্জিল পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। (বুখারী, ফাতহুল বারী)

ফায়দা ঃ ঐ যমানার শিক্ষা এইরূপ ছিল না, যেমন এই যমানায় আমরা ভিন্নভাষীদের রহিয়াছে। বরং যাহা কিছু পড়িতেন উহা তফসীর সহকারে পড়িতেন। এইজন্য হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) তাফসীরের বহু বড় ইমাম হইয়াছিলেন। কেননা, বাল্যকালের মুখস্থ বিষয় খুব ভালরূপে মনে থাকে। তাই তাফসীর সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে যত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, অন্যদের হইতে ইহার চেয়ে অনেক কম বর্ণিত রহিয়াছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ মুফাসসির হইতেছেন ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)। আবু আবদুর রহমান (রাযিঃ) বলেন, যে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম আমাদিগকে কুরআন শরীফ শিক্ষা দিতেন তাঁহারা বলিতেন, সাহাবা (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে কুরআনে পাকের দশটি আয়াত শিখিতেন। এই দশ আয়াত অনুযায়ী এলেম এবং আমল না হওয়া পর্যন্ত অপর দশ আয়াত শিখিতেন না। (মুন্তাখাব কাঃ উম্মাল)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের সময় হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)এর বয়স ছিল তের বৎসর। এই অল্প বয়সে তিনি তাফসীর ও হাদীস জ্ঞানে যে স্থান লাভ করিয়াছিলেন তাহা সুস্পষ্ট কারামত এবং ঈর্ষাযোগ্য বিষয়। তিনি তাফসীরের ইমাম ছিলেন। বড় বড় সাহাবীগণ তাঁহার নিকট তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেন।

অবশ্য ইহা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই দুয়ার বরকত ছিল। একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এস্তেঞ্জায় তশরীফ লইয়া গেলেন। এস্তেঞ্জা হইতে ফিরিয়া দেখেন লোটাভরা পানি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ইহা কে রাখিয়াছে? উত্তরে বলা হইল, ইবনে

আব্বাস রাখিয়াছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই খেদমত ভাল লাগিল এবং দোয়া করিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দ্বীনের জ্ঞান এবং কুরআনের বুঝ দান করুন। ইহার পর একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল নামায পড়িতেছিলেন। তিনিও নিয়ত বাঁধিয়া তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া গেলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে হাত দ্বারা টানিয়া বরাবরে দাঁড় করাইলেন। কেননা, মুক্তাদী একজন হইলে ইমামের বরাবর দাঁড়ানো চাই। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে মশগুল হইয়া গেলেন। তিনি খানিকটা পিছনে সরিয়া দাঁড়াইলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন, আপনি আল্লাহর রাসূল, আপনার বরাবরে আমি কিরূপে দাঁড়াইতে পারি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেম ও দ্বীনি সমঝের জন্য দোয়া করিলেন। (ইসাবাহ)

(১৭) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ)এর হাদীস মুখস্থ করা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) ঐ সকল এবাদতগুজার ও দুনিয়াবিমুখ সাহাবীদের মধ্যে ছিলেন, যাহারা দৈনিক কুরআন মজীদ এক খতম করিতেন। সারারাত্র এবাদতে মশগুল থাকিতেন এবং দিনে সর্বদা রোযা রাখিতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে এত অধিক মেহনতের উপর সতর্কও করিয়াছেন এবং এরশাদ করিয়াছেন যে, ইহাতে শরীর দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং সারারাত্রি জাগ্রত থাকার কারণে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। শরীরেরও হক রহিয়াছে, পরিবার--পরিজনেরও হক রহিয়াছে এবং সাক্ষাতকারীদেরও হক রহিয়াছে। তিনি বলেন, আমার নিয়ম ছিল প্রতিদিন এক খতম করিতাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এক মাসে এক খতম পড়। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে যৌবন ও শক্তির দ্বারা উপকৃত হওয়ার অনুমতি দান করুন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঠিক আছে বিশ দিনে এক খতম কর। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা অনেক কম, আমাকে আমার যৌবন ও শক্তি দ্বারা উপকৃত হওয়ার অনুমতি দান করুন। মোটকথা এইভাবে আরজ করিতে থাকিলাম। অবশেষে তিন দিনে এক খতম করিবার অনুমতি হইল।

তাহার অভ্যাস ছিল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন যাহাতে স্মরণ থাকে। এমনিভাবে তাঁহার নিকট হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লিপিবদ্ধ হাদীসসমূহের একটি সংকলন ছিল উহার নাম তিনি 'সাদেকা' রাখিয়াছিলেন। তিনি বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাহা শুনিতাম উহা মুখস্থ করিবার উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলিতাম। লোকেরা আমাকে এই বলিয়া নিষেধ করিলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তো একজন মানুষ। কখনও রাগ ও নারাজীর কারণে কাহাকেও কিছু বলেন। কখনও খুশী এবং হাসি কৌতুক অবস্থায়ও কিছু বলেন, সুতরাং সব কথা লিখিও না। আমি লেখা বন্ধ করিয়া দিলাম। একবার আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইহা ব্যক্ত করিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, লিখিতে থাক, ঐ পাক যাতের কসম, যাহার হাতে আমার জান, এই মুখ হইতে খুশী বা নারাজী কোন অবস্থাতেই হক ছাড়া কোন কথা বাহির হয় না। (আহমদ, ইবনে সা'দ)

ফায়দা ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বড় ধরনের আবেদ ও অধিক ইবাদতকারী হিসাবে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) বলেন, সাহাবাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ছাড়া আমার চাইতে অধিক হাদীস বর্ণনাকারী আর কেহ নাই। কেননা তিনি লিখিতেন আমি লিখিতাম না। ইহাতে বুঝা যায় যে, তাহার বর্ণনা আবু হুরাইরা (রাযিঃ)এর চাইতেও অনেক বেশী। যদিও আমাদের যুগে হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ)এর হাদীস তাহার চেয়েও অনেক বেশী পাওয়া যায়। ইহার অনেক কারণ রহিয়াছে। কিন্তু এত অধিক ইবাদত সত্ত্বেও ঐ যামানায় তাহার বর্ণিত প্রচুর হাদীস মওজুদ ছিল।

(১৮) হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাযিঃ)এর কুরআন হিফয করা

হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাযিঃ) ঐ সকল উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবাদের মধ্যে ছিলেন, যাহারা সেই যুগের বড় আলেম ও বড় মুফতী হিসাবে পরিগণিত হইতেন। বিশেষ করিয়া তিনি ফারায়েয শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, মদীনা মুনাওরায় তিনি ফতোয়া, বিচার, ফারায়েয ও কেরাত বিষয়ে শীর্ষস্থানীয় লোকদের মধ্যে গণ্য হইতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করিয়া

মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করেন ঐ সময় তিনি অল্পবয়স্ক বালক ছিলেন, তাঁহার বয়স ছিল এগার বৎসর। এইজন্যই প্রথম দিকের যুদ্ধসমূহ যেমন বদর প্রভৃতিতে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও অংশগ্রহণের অনুমতি পান নাই। হিজরতের পাঁচ বৎসর পূর্বে ছয় বৎসর বয়সে তিনি এতীমও হইয়া গিয়াছিলেন। হিজরতের পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় পৌঁছিলেন তখন অন্যান্য লোক যেমন তাঁহার খেদমতে হাজির হইতেছিলেন এবং বরকত হাসিলের জন্য বাচ্চাদিগকেও সঙ্গে আনিতেছিলেন তখন যায়েদ (রাযিঃ)কেও তাহার খেদমতে হাজির করা হইল। যায়েদ (রাযিঃ) বলেন, আমাকে যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করা হইল তখন আরজ করা হইল যে, এই ছেলেটি নাজ্জার গোত্রের। সে আপনার আগমনের পূর্বেই কুরআনে পাকের সতরটি সূরা মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরীক্ষা করার জন্য আমাকে পড়িতে বলিলেন। আমি তাঁহাকে সূরায়ে কা’ফ তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলাম। তিনি আমার পড়া পছন্দ করিলেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদীদের নিকট যে সমস্ত চিঠি পাঠাইতেন সেইগুলি ইহুদীরাই লিখিত। একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন যে, ইহুদীদের দ্বারা যে সকল চিঠিপত্র লিখা হয় উহাতে আমার পূর্ণ আস্থা হয় না। হয়ত তাহারা কোন বেশকম করিয়া ফেলে। তুমি ইহুদীদের ভাষা শিখিয়া লও। হযরত যায়েদ (রাযিঃ) বলেন যে, আমি পনের দিনের মধ্যে তাহাদের হিব্রুভাষায় পারদর্শী হইয়া গিয়াছিলাম। ইহার পর হইতে যেই সকল পত্র তাহাদের প্রতি পাঠানো হইত উহা আমিই লিখিতাম এবং যেই সকল পত্র ইহুদীদের পক্ষ হইতে আসিত উহা আমিই পড়িতাম।

আরেক হাদীসে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমাকে কোন কোন লোকের নিকট সুরিয়ানী ভাষায় পত্র লিখিতে হয়, তাই আমাকে সুরিয়ানী ভাষা শিখিতে বলিলেন। আমি সতর দিনে সুরিয়ানী ভাষা শিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। (ফাতহুল বারী, ইসাবাহ)

(১৯) হযরত ইমাম হাসান (রাযিঃ)এর শৈশবে এলেম চর্চা

সাইয়্যেদ হযরত হাসান (রাযিঃ)এর জন্ম অধিকাংশের মতে ৩য় হিজরীর রমযান মাসে হয়। এই হিসাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময় তাঁহার বয়স সাত বৎসর আরও কয়েক মাস

হয়। সাত বৎসর বয়সই বা কি, যাহাতে কোন ইলমী কৃতিত্ব অর্জন করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহার নিকট হইতে হাদীসের কয়েকটি রেওয়ায়াত বর্ণিত রহিয়াছে। আবুল হাওরা নামক এক ব্যক্তি হযরত হাসান (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কথা আপনার স্মরণ আছে কি? তিনি বলিলেন, হাঁ। আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যাইতেছিলাম। পথে সদকার খেজুরের একটি স্তূপ পড়িয়াছিল। আমি সেখান হইতে একটি খেজুর তুলিয়া মুখে দিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, খাখ্, খাখ্। আর আমার মুখ হইতে বাহির করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর বলিলেন, আমরা সদকার মাল খাই না। আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে শিখিয়াছি।
(আহমদ)

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিতর নামাযে পড়িবার জন্য এই দোয়া শিখাইয়াছিলেন—

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَ تَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ
وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَا يُقْضٰى
عَلَيْكَ اِنَّهٗ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

“হে আল্লাহ! আপনি যাহাদিগকে হেদায়াত দান করিয়াছেন তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া আমাকেও হেদায়াত দান করুন। আপনি যাহাদিগকে নিরাপত্তা দান করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে গণ্য করিয়া আমাকেও নিরাপত্তা দান করুন। আপনি আমার সমস্ত কাজের জিম্মাদার হইয়া যান যেমন আপনি আরো বহুলোকের জিম্মাদার রহিয়াছেন। আর যাহা কিছু আমাকে দান করিয়াছেন উহাতে বরকত দান করুন। আর যাহা কিছু আমার তকদীরে রাখিয়াছেন উহার ক্ষতি হইতে আমাকে বাঁচান; আপনি যাহা চান তাহা করিতে সক্ষম। আপনার বিরুদ্ধে কেহ কোন ফয়সালা করিতে পারেনা। আপনি যাহার অভিভাবক হইয়া যান সে কখনও লাঞ্ছিত হইতে পারে না। আপনার সত্তা বরকতময় এবং সর্বোচ্চ ও সর্বমহান।”

ইমাম হাসান (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত ঐ স্থানে বসিয়া থাকিবে সে জাহান্নামের অগ্নি হইতে মুক্তি পাইবে।

হযরত হাসান (রাযিঃ) কয়েকবার পায়দল হজ্জ করিয়াছেন এবং